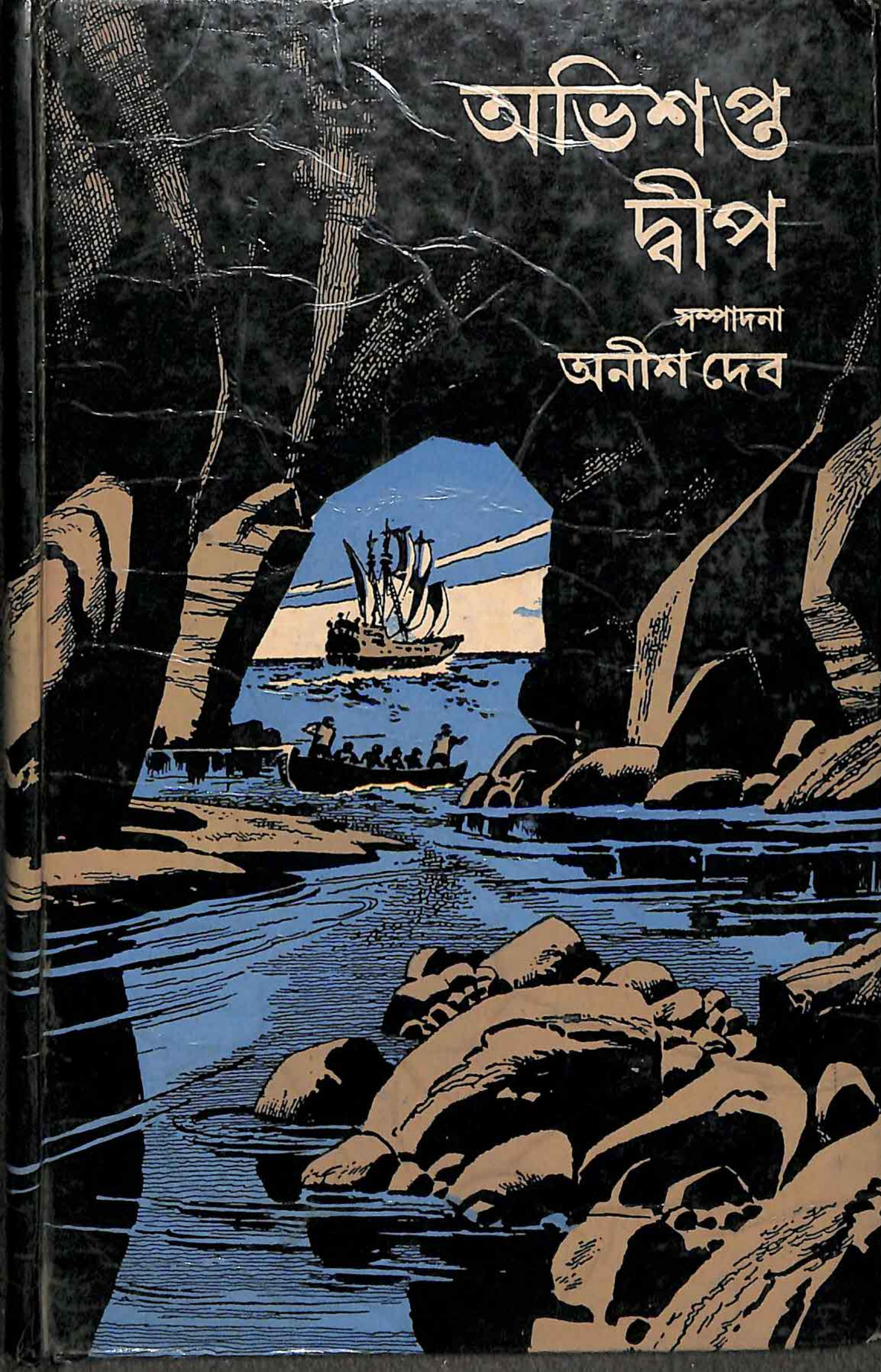
অভিশপ্ত দ্বীপ

সম্পাদনা
অনীশ দেব



অভিশপ্ত দ্বীপ

রোমাঞ্চকর বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প সংকলন

সম্পাদনা

অনীশ দেব

অঙ্কুর প্রকাশনী [] সাইত্রিশের এ, কলেজ রো কলকাতা নয়

প্রকাশক :
হরিনারায়ণ বসাক
৩৭এ, কলেজ রো
কলকাতা-৭০০০০৯

প্রকাশ : অক্ষয়তৃতীয়া ১৩৯৩

প্রচ্ছদ : বিমল দাস

অলঙ্করণ : অনন্যা

মুদ্রাকর :
শ্রীকালিচরণ দাস
মহাকালী প্রেস
১৯/ই গোয়াবাগান ষ্ট্রীট
কলকাতা—৭০০০০৬

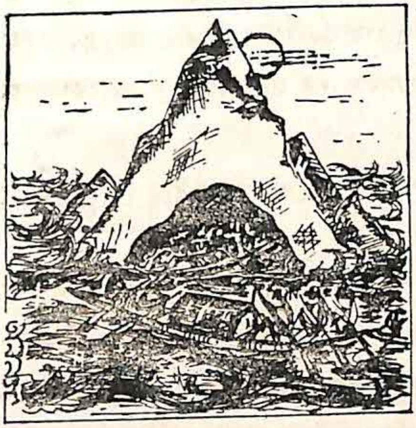
মূল্য : দশ টাকা

উৎসর্গ

আমার শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক
ডঃ অসিত দত্তকে

এতে আছে

অভিশপ্ত দ্বীপ-প্রেমেন্দ্র মিত্র, রহস্য দ্বীপের কাহিনী-ক্ষিতীন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য, দ্বিতীয় জগত-বিমল কর, ভয়ঙ্কর কাচ-অদ্রীশ বর্ধন, ফাঁদ-সমরজিৎ কর, লাল জঙ্গল-সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, ঘটোৎকচের জাগরণ-সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, চোখ-আনন্দ বাগচী, আর মন খারাপ হবে না-শেখর বসু



অভিশপ্ত দ্বীপ

প্রেমেন্দ্র মিত্র

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে কম্বোজের পূর্ব্ব উপকূলে একটি অসাধারণ রহস্যময় ব্যাপার ঘটে।

কম্বোজের পুরাণো সরকারী দপ্তরে তার উল্লেখ আছে কিন্তু কোনো বিস্তৃত বিবরণ নেই।

১৮৮০ খৃষ্টাব্দ থেকে কম্বোজের পূর্ব্ব উপকূলে ভয়ানক জলদস্যুর উৎপাত আরম্ভ হয়। কম্বোজের জল পুলিশ, নৌ-সেনা প্রাণপন চেষ্টা করে তাদের দমন করতে পারে না। দমন করা দূরে থাক— তাদের সন্ধান পর্য্যন্ত পায় না।

কোথা থেকে সিন্ধু-শকুনের মত এই জলদস্যুদের বেগবান স্লুপগুলি এসে বড় বড় বাণিজ্য-তরীর ধনসম্পদ যে লুটে নিয়ে যেত কম্বোজের যুদ্ধতরীগুলি কিছুই বুঝে উঠতে পারতো না। কম্বোজের সমস্ত কড়া পাহারা এড়িয়ে রাজকর্মচারীদের চোখে ধূলি দিয়ে এই জলদস্যুর দল এমন অনায়াসে তাদের কাজ হাসিল করে যেতো যে, শেষে তারা মানুষ নয় এমনি একটা জন প্রবাদ সমস্ত কম্বোজের অশিক্ষিত মাঝি-মাল্লার ভেতর রটে গেল।

বাণিজ্যতরীর জন্য মাঝিমাল্লা পাওয়া ক্রমে দুষ্কর হয়ে উঠল।

তারা মানুষের বিরুদ্ধে লড়ে জান দিতে প্রস্তুত কিন্তু দেবতার বিরুদ্ধে তারা কি করতে পারে এই হোল তাদের বুলি। পূর্ব্ব উপকূলের ব্যবসা-বাণিজ্য একরকম বন্ধ। উপরওয়ালাদের তাড়া খেয়ে পুলিশ ও নৌ-সেনা মরিয়া হয়ে জলদস্যু দমনে লেগে গেল। কিন্তু কিছুই হোল না। কম্বোজের পূর্ব্ব উপকূলে দস্যুদের প্রতাপ অক্ষুণ্ণই রইল। জলদস্যুরা যে মানুষ নয়, এই জনরব এই সব ব্যাপারে আরো বিস্তৃত হয়ে পড়লো।

পঞ্চাশ বছর বাদে কম্বোজে এখনো সে প্রবাদ লোকের মুখে শোনা যায়। তার কারণও আছে।

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে সাইগনের কাছে একটী অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত মসলা বোঝাই প্রকাণ্ড ষ্টীমার লুট হয়ে যায়। কম্বোজে সেই প্রথম ষ্টীমার— যদিও সেকেলে কিন্তু সাধারণ স্লুপের চেয়ে অনেক বড়। এই ষ্টীমার লুট হওয়ার পর সেখানকার সদাগর মহলে রীতিমত বিভীষিকা দেখা দেয়। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই ষ্টীমারই জলদস্যুদের শেষ লুট। তারপর কম্বোজের প্রান্ত থেকে তারা যেন যাদুমন্ত্রে অদৃশ্য হয়ে যায়। যাদের দাপটে সারা সমুদ্র একদিন থরহরি কম্পিত হ'ত, হঠাৎ তারা কেন এমন নিশ্চিহ্ন হয়ে অন্তধান হতে পারে এ রহস্যের কোনো মীমাংসা হয় না। এরপর জলদস্যুদের সম্বন্ধে নানা আজগুবি কিংবদন্তী রটা আশ্চর্য্য মোটেই নয়।

কম্বোজের সরকারী দপ্তরে এই রহস্যময় ব্যাপারের উল্লেখ আছে, কিন্তু কেমন করে তারা লোপ হয়ে গেল, এ প্রশ্নের কোনো উত্তর নেই।

যে সমস্যার কথাই কখনও শুনিনি, সুদূর বাঙ্গলা দেশের একটি সহরে বসে তার সমাধান জানতেপারবো একথা কে ভেবেছিলো! যে রকম সামান্য ব্যাপারের ভেতর দিয়ে এই রহস্যের কথা জানতে পারি তা ভাবলে এখন বিস্ময় লাগে।

সুধীরদের বাড়ী সেদিন সকালে নিমন্ত্রণ ছিলো। নিমন্ত্রণ এমন তাদের বাড়ী প্রায়ই হয় কিন্তু সেদিন একটী বিশেষ উপলক্ষ্যও ছিলো।

সুধীরের জ্যেঠামশাই সুদূর সুমাত্রায় ডাক্তারী করতেন, বহুদিন বাদে সেখানকার কাজ ছেড়ে দিয়ে দেশে ফিরে এসেছেন—সেই উপলক্ষ্যেই খাওয়ার আয়োজন।

এ কয়দিন স্কুলে ও স্কুলের বাইরে সুধীরের মুখে তার জ্যেঠামশায়ের কথা ছাড়া আর কোনো কথা ছিলো না। সত্তর বৎসরের বৃদ্ধের এমন কি অসাধারণত্ব থাকতে পারে যাতে চোদ্দ বছরের কিশোরের মন মুগ্ধ হয়ে যায় এতদিন বুঝতে পারিনি। কিন্তু বঙ্কিমবাবুকে দেখবামাত্র সে প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেলাম। বৃদ্ধ সত্যই অসাধারণ। প্রথমতঃ বাঙ্গালীর ভেতর অমন চেহারাই তুর্লভ। সত্তর বৎসর বয়স যে তাঁর হয়েছে একথা তিনি নিজে না বল্লে বিশ্বাস করাই কঠিন। দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহ, মুখে বয়সের চিহ্ন আছে বটে কিন্তু বার্দ্ধক্যের জীর্ণতার পরিচয় নেই। গাম্ভীর্য্য দূরে থাক, মুখে বালকের মত কৌতুকের হাসিটি লেগেই আছে। ছোটো ছেলে মেয়েদের সঙ্গে অত্যন্ত সহজে মিশে যাবার দেখলাম তাঁর অসাধারণ ক্ষমতা।

তাঁর জীবনের বিবরণ যা শুনলাম তাও অদ্ভুত। অত্যন্ত ডানপিটে তুরন্ত ছিলেন ছেলেবেলায়। সেজন্যে তাঁকে নানারকম শাস্তি ঘরে-বাইরে সহ্য করতে হয়েছে। স্কুল থেকে একবার কি কারণে বিতাড়িত হয়ে তিনি আর লজ্জায় বাড়ী ফেরেন না। বহুদিন পর্য্যন্ত তাঁর খবর না পেয়ে সকলে তাঁর জীবনের আশা পর্য্যন্ত ত্যাগ করেছিলো। অবশেষে একদিন বিলাতের ডাকে তাঁর বাবার নামে একটি চিঠি এসে হাজির। চিঠি খুলে তিনি তো অবাক! যে ছেলে স্কুলে কোনোরকমে প্রমোশন পাবে কিনা বছরের শেষে সেই তুশ্চিন্তায় তাঁকে রাতের পর রাত অনিদ্রায় কাটাতে হ'ত, বিলাত গিয়ে সে সেখানকার প্রবেশিকার বেড়া উৎরে একেবারে মেডিক্যাল কলেজ গিয়ে ভর্ত্তি হয়েছে। শুধু ভর্ত্তি হয়নি সেখানে পড়াশুনায় দস্তুর মতো কৃতিত্ব দেখিয়ে সে শিক্ষকদের বিশেষ প্রশংসালাভ করেছে।

তারপর সেখানকার মেডিক্যাল কলেজ থেকে সসম্মানে পাশ হয়ে দেশে ফিরে আসেন। কিন্তু ঘরে বসে থাকা তাঁর ধাতে সইবে

কেন! কিছুদিন বাদেই সুমাত্রার কাছে একটা বড় হাসপাতালের ভার পেয়ে তিনি আবার সাগরে পাড়ি দেন।

সেই বিদেশেই তাঁর সমস্ত জীবন কেটেছে। এই বৃদ্ধ বয়সে সে কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করে তিনি দেশে শেষ জীবন কাটাবার জন্যে ফিরেছেন।

এই বিবরণ শুনেই তখন বিস্মিত হয়েছিলাম, জানতাম না যে তাঁর জীবনে এমন ঘটনা ঘটেছে, যার কাছে এসমস্ত ব্যাপার নিতান্ত তুচ্ছ সাধারণ।

সকলে একসঙ্গে খেতে বসেছিলাম। সুধীরের জ্যেঠামশাই নানা রকম মজার গল্প করে খাওয়ার আসর জমিয়ে রেখেছিলেন। সুমাত্রার লোকেদের একরকম অদ্ভুত নিয়মের কথা বলেছেন এমন সময় হঠাৎ পাতার দিকে চেয়ে তাঁর মুখ যেন বিবর্ণ হয়ে গেল—ব্যস্ত সমস্ত হয়ে বললেন—"না না ও আমি খাই না—ও কাঁকড়া তুলে নিয়ে যাও।"

আমরা তার মুখ দেখে চুপ করেছিলাম, সুধীর তার পাশে বসেছিলো অত লক্ষ্য করেনি, বল্লে—"কেন জ্যেঠাবাবু এই বুঝি আপনার দাঁতের জোর কাঁকড়ার দাঁড়া চিবোতে পেছিয়ে যাচ্ছেন"।

বঙ্কিমবাবু একটু হাসবার চেষ্টা করে বললেন—"দাঁতের জোর ঠিক আছে রে। কিন্তু ও কাঁকড়া দেখলে আমার সমস্ত শরীর কেমন করতে থাকে।" তারপর উঠে পড়ে বললেন, "আমার খাওয়া হয়ে গেছে বাপু, বুড়ো মানুষ বসে থাকতে পারলুম না—কিছু মনে কোরনা যেন।"

খাওয়া তাঁর তখনও হয়নি। আমরা সবাই সত্যই অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। সুধীরের বাবা ছুটে এসে বললেন—"ওকি দাদা কিছু না খেয়েই উঠে পড়লে যে?" "হয়েছে হয়েছে আমার খাওয়া হয়ে গেছে। এখন কি আর আগের মত খেতে পারি।"—বলে বঙ্কিমবাবু এত তাড়াতাড়ি চলে গেলেন যেন এ ঘরে তাঁর দম বন্ধ হয়ে আসছে।

কাঁকড়া পাতে দেওয়ার পর একি হ'ল আমরা বুঝতে না পেরে থ হয়ে রইলাম।

দুপুর বেলা বাইরের ঘরে বসে সুধীর বললে, "কেন খেলেন না আপনাকে বলতেই হবে জ্যাঠাবাবু?"

দু একবার এড়াবার চেষ্টা করে বঙ্কিমবাবু অবশেষে একটু হেসে হেসে বললেন—"কাঁকড়া দেখলেই আমার অজ্ঞান হবার মত হয়—তাই না উঠে পারলাম না।"

"কেন জ্যাঠাবাবু?" সুধীর অমনি ছাড়বার ছেলে নয়। খানিক চুপ করে বঙ্কিমবাবু বললেন—"তবে শোন্, কিন্তু শেষকালে আমাকে পাগল ভাবিস নি যেন। এই ভয়ে পৃথিবীর কাউকে একথা আজো জানাই নি। মানুষের স্বভাব ভারী মজার, এত বড় আশ্চর্য্য দুনিয়ার বাস করেও অত্যন্ত সাধারণ ব্যাপার ছাড়া আর কিছুতেই বিশ্বাস করতে সে নারাজ।"

বঙ্কিমবাবু গড়গড়ার নলটি একধারে সরিয়ে রেখে আবার বললেন—"তোরা বড় জোর মনে করবি বুড়োর ভীমরতি ধরেছে। তা বুড়ো হলে অমন হয়। এককালে এই গল্প বললে হয়তো আমার চাকরী মান সম্ভ্রম সব যেতো। মানুষের অসাধারণের উপর এমনি অবিশ্বাস।"

এইবার গল্প শুরু হল! বঙ্কিমবাবু বলতে লাগলেন পঞ্চাশ বছর আগের কথা :—

সুমাত্রায় তখন বছর কয়েক চাকরী করেছি। এমন সময় সেখানে ভয়ানক কাণ্ড সুরু হোল। সুমাত্রায় তখন টিকে দেবার বীজ পাওয়া দুষ্কর ছিলো। শুনলাম সাইগনে একজন ফারাসী ডাক্তার নিজের পরীক্ষাগার করে টীকার বীজ তৈরী করেছেন। সেই টীকার বীজ ভালো হলে তাই কিনে আনবো বলে সাইগনে গেলাম। সাইগনে কয়েক দিন থেকে টীকার বীজ সংগ্রহ করে আবার সুমাত্রায় ফেরবার আয়োজন করবার সময় ভয়ানক বিপদে পড়লাম।

—কম্বোজের পূর্ব উপকূলে তখন ভয়ানক জল দস্যুর উৎপাত।

আসবার সময় সুমাত্রার মাঝি মাল্লারা তেমন ভয় পায়নি। কারণ সুমাত্রায় এই জল দস্যুদের সম্বন্ধে বেশী গুজব পৌঁছায় নি। কিন্তু সাইগনে কয়েক দিন থেকে নানা কথা শুনে তারা ইতিমধ্যে ভড়কে গিয়েছিল তারা। দেশের টানেও এই জল দস্যুদের ভেতর দিয়ে আর যেতে রাজী নয়। শুধু লুট তরাজও নয় অকারণে মানুষ মারতেও এই দস্যুদের নাকি যেন আনন্দ।

ফেরবার জাহাজ না পেয়ে কি করবো ভাবছি, এমন সময় সেই ফরাসী ডাক্তার খবর দিলেন যে, একটি ফরাসী কোম্পানী নূতন একটি ষ্টীমার আনিয়েছে। কাল সে ষ্টীমার প্রথম যবদ্বীপ হয়ে সাইগনে আসবে। তাইতে আমি আবার সুমাত্রায় ফিরতে পারি। সত্যি কথা বলতে কি—হাতে যেন স্বর্গ পেলাম। শুধু মাঝি মাল্লাদেরই দোষ দেব কেন এই জল দস্যুদের সম্বন্ধে মনে যথেষ্ট আমারই ভয় ছিলো। সাধারণ পাল-তোলা জাহাজে যাওয়া কত বিপজ্জনক তাও জানতাম, অকারণে প্রাণ হারাবার বাসনাও ছিলো না। এই ষ্টীমারটিতে যেতে পেয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে গেলাম।

এই দেশে এই প্রথম ষ্টীমার। সে ষ্টীমার আক্রমণ করা দূরে থাক, ষ্টীমার দেখলে জল দস্যুরা বোধ হয় ভয়েই খুন হবে।

সঙ্গে বেশী কিছু জিনিষপত্র ছিল না। টিকের বাদে ষ্টীমারে উঠলাম। প্রকাণ্ড মজবুত ষ্টীমার। জল দস্যুদেরই জন্যে তার দুই প্রান্তে দুটি কামান বসানো। তা ছাড়া ষ্টীমার রক্ষা করবার জন্যে জন পঞ্চাশ সৈন্যও নেওয়া হয়েছিল। ষ্টীমারে উঠে অত্যন্ত আনন্দ হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল আসুক জলদস্যু।

সকালে ষ্টীমার ছেড়ে সন্ধ্যায় যখন মাঝ সমুদ্রে পাড়ি দিচ্ছি তখন পর্যন্ত জল দস্যুদের কোন চিহ্ন দেখা গেল না বলে একটু হতাশই যেন হলাম। জল দস্যুদের মজাটা একবার টের পাইয়ে দেবার সুবিধে হল না বলে।

কিন্তু জল দস্যুরা এল।

রাত তখন বেশী নয়। চারিদিকে অন্ধকার। হঠাৎ ষ্টীমারের

প্যাড্‌লের গম্ভীর আওয়াজ ছাড়িয়ে ষ্টীমারের তীক্ষ্ণ হুইসল শোনা গেল! পর মুহূর্তে ষ্টীমারের ইঞ্জিন থেমে গেল। ব্যাপার কি?

যাত্রীরা সবাই সামনের ডেকে গিয়ে ভিড় করলাম।

ক্যাপ্টেন শশব্যস্ত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, সৈন্যরা কামান বন্দুক বাগিয়ে ঠিক হয়ে আছে। সামনে বহুদূরে গুটিকতক আলো দেখা যাচ্ছে।

শুনলাম, আলো আর কিছুর নয় জল দস্যুদের নৌ বহরের। এবার অন্ততঃ তারা আক্রমণ করতে আসেনি। আমরাই তাদের আক্রমণ করছি।

ষ্টীমার থেকে একসঙ্গে কামান ও বহু বন্দুক গর্জ্জন করে উঠ্‌ল।

জলদস্যুরা আমাদের এতক্ষণ দেখতে পায়নি বলে মনে হল। কারণ দেখা মাত্র টপ টপ করে তারা নৌকোর আলো সব নিবিয়ে ফেললে। কিন্তু আমাদের কাপ্তেন ছাড়বার পাত্র নয়, সে বল্লে অন্ধকারেই গুলি চালাও।

তখন সার্চ লাইট বলে কিছু ছিলনা। থাকলে আমাদের অমন সর্ব্বনাশ বোধ হয় হ'তনা।

অন্ধকারেই গুলি চলতে লাগল। জল দস্যুদের স্লুপ গুলিতে মাঝে মাঝে কোথাও আলো জ্বলে উঠে। আমাদের ষ্টীমার তাই দেখেই তাদের ধাওয়া করে, আর গুলি চালায়।

কাপ্তেন বলছেন শুনতে পেলাম—আজ আর রেহাই দেওয়া নেই। ভীমরুলের চাক ভেঙ্গে তবে ছাড়ব!

ষ্টীমার ক্রমশঃ তাদের স্লুপগুলির বরাবর এসে পড়েছিল। অন্ধকারেও অস্পষ্ট ভাবে স্লুপগুলি দেখা যাচ্ছিল। এমন সময় হঠাৎ সবাই ষ্টীমারের ওপর উবুড় হয়ে পড়ে গেলাম। তার সঙ্গে ভয়ঙ্কর আওয়াজ!

প্রকাণ্ড ষ্টীমারটা যেন মর্মান্তিক ভাবে আহত হয়ে কেঁপে উঠল।

ষ্টীমার চোরা পাহাড়ে ঠেকে গেছে।

ক্যাপ্টেনও পড়ে গিয়ে ছিলেন! উঠে পড়ে উন্মত্তের মত তিনি

ছুটে গিয়ে তাড়াতাড়ি ইঞ্জিন থামিয়ে দিলেন কিন্তু তখন আর উপায় নেই। তলায় প্রকাণ্ড চিড় হয়ে জাহাজে তখন রাশী রাশী জল হচ্ছে।

জলদস্যুরা যে এই উদ্দেশ্যেই আমাদের প্রলোভন দেখিয়ে এপথে টেনে এনেছে তা কে জানত।

ষ্টীমার ঠেকে যাবার সঙ্গে সঙ্গে যে ভয়ঙ্কর ব্যাপার সুরু হ'ল তার আর বর্ণনা হয় না। জলদস্যুদের কয়েকটি মাত্র স্লুপ ষ্টীমারকে প্রলোভন দেখিয়ে ডুবো পাহাড়ে ঠেকাবার জন্যে সামনে ছিল। তাদের বেশীভাগ স্লুপই ছিল পেছনে। তারা ইতিমধ্যে কোথা থেকে এসে ছেঁকে ধরল।

অন্ধকারে চারিদিকে শুধু ভীত যাত্রীদের আর্ত্তনাদ। জলদস্যুরা নৃশংস ভাবে তাদের হত্যা করতে সুরু করে দিলে, এই জলদস্যুদের হাতে মরার চেয়ে জলে ডুবে মরা ভাল বলে জলে ঝাঁপ দিতে যাচ্ছি, এমন সময় পেছন থেকে মাথায় একটা প্রচণ্ড আঘাত খেয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়লাম।

যখন জ্ঞান হল তখন দিন। দেখি হাত পা বেঁধে আমায় একটি স্লুপের উপর দস্যুরা ফেলে রেখেছে। বুঝলাম ষ্টীমার ডুবেছে এবং আমায় এরা ক্রীতদাস করে নিয়ে ছলেছে। অনেক কষ্টে হাত পা বাঁধা অবস্থায় উঠে বসলাম। সামনে দেখলাম সমুদ্রের মাঝে প্রচণ্ড এক পাহাড়। এই পাহাড়টিকে চিনতাম। জাহাজ-টাহাজ এই পাহাড়ের পাশ দিয়েই যাতায়াত করে, কিন্তু পাহাড়ের গাছে আছড়ে মরবার ভয়ে কেউ বড় কাছে ঘেঁষেনা।

এখন দেখে আশ্চর্য্য হলাম যে, জলদস্যুদের নৌকোগুলি এই পাহাড়ের দিকে এগিয়ে চলেছে।

সমুদ্র থেকে পাহাড়টি খাড়া উঠেছে জানি। তার কোথাও কোনো নৌকো দূরের কথা মানুষ দাঁড়াবার আশ্রয় নেই। তবে এই জলদস্যুরা চলেছে কোথায়? এই পাহাড় তাদের ঘাঁটি হলে তারা অনেক দিন ধরা পড়ে যেত। সমস্ত বাণিজ্য জাহাজ এই পাহাড়ের ধার দিয়েই ত যায়।

পাহাড়ের কাছে পৌঁছে কিন্তু জলদস্যুদের আড্ডার রহস্য অনেকটা পরিস্কার হয়ে গেল। পাহাড়ের চারি ধারে কোথাও দাঁড়াবার জায়গা না থাকলেও এক ধারে একটি নাতি বৃহৎ গুহা পথ রয়েছে। সমুদ্রের জল তার ভেতর দিয়ে চলে গেছে। আমাদের স্লুপটি ক্রমশঃ এগিয়ে এসে তার ভেতরে ঢোকামাত্র সব অন্ধকার হয়ে গেল।

গুহা পথটা বেশী চওড়া নয়। আমাদের স্লুপ অতিকষ্টে তার ভেতর দিয়ে যাচ্ছে বুঝলাম।

কিন্তু কোথায়?

অন্ধকারে এমন প্রায় মিনিট দশেক কাটল এবং তারপর চারদিক পরিষ্কার হয়ে গেল। দেখি সামনে প্রকাণ্ড জায়গা। তার মাঝে একটি ছোট হ্রদের মত। সমুদ্রের জল সেই হ্রদে গিয়ে শেষ হয়েছে। স্লুপ গুলি সেই হ্রদের একধারে ভিড়ল সমুদ্রের পাহাড়ের মাঝখানে এমন গোপন স্থান ছিল কে জানত? এইখানে মানুষের অগোচরে জল দস্যুরা নির্ভয়ে তাদের লুটের মাল সঞ্চয় করে বসবাস করে।

আমায় ধরে স্লুপ থেকে নামিয়ে দেবার পর দেখলাম, আমার মতো আরো অনেককে তারা বন্দী করে এনেছে তাদের দাসবৃত্তি করার জন্য।

এরপর আমাদের যে জীবন সুরু হ'ল, তার দুঃখ আর বলে শেষ করা যায় না। মানুষ যে এমন পিশাচ হতে পারে এই জল দস্যুদের দেখবার আগে তা কখনও কল্পনা করিনি। সারাদিন তাদের জন্যে অকারণে হাড়ভাঙ্গাখেটে ভালোকরে একটু খাবার উপায়ও আমাদের ছিল না। চোখের সামনে তারা উন্মত্ত হয়ে, সেই খাবার ফেলে ছড়িয়ে নষ্ট করত, কিন্তু আমাদের আধপেটা খাওয়াও তাদের সহ্য হত না।

সারাদিনের পর একটিবার মাত্র দাসেদের অত্যন্ত কদর্য আহার মিলতো। সেই কদর্য খাবারও সুখে খাবার উপায় নেই। জল-দস্যুদের ত লুট করা ছাড়া আর কাজ নেই। একজনের হয়ত ইচ্ছে হল ক্রীতদাসদের নিয়ে একটু মজা করা যাক। খেতে বসেছি— হঠাৎ হাসতে হাসতে এসে লাথিমেরে সব খাবার ফেলে দিলে। কুড়োতে

গেলে আবার লাথি। প্রতিবাদ করতে গেলে একটি তরোয়ালের খোঁচায় ভবলীলা সাঙ্গ।

ক্রীতদাসদের এক জোট হয়ে বিদ্রোহ করবার উপায় নেই। কারণ, প্রথমত—আমরা অস্ত্রহীন, দ্বিতীয়ত আমাদের সকলের পায় বেড়ী। সেই বেড়ী নিয়েই আমাদের চলতে-ফিরতে হ'ত।

দিনের পর দিন এই ভাবেই কেটে যাচ্ছিল। যে সাহেবি পোষাকে এসেছিলাম, সেই পোষাকের আর পরিবর্তন হয়নি। সেটি ছিঁড়ে-খুঁড়ে প্রায় কুটি কুটি হয়ে গিয়েছিল। সেদিকে নজর ও আর ছিল না। একদিন কিন্তু সেই পোষাক থেকে একটি জিনিস খুঁজে পেয়ে ক্ষণিকের জন্য উল্লাসত হয়ে উঠলাম।

বসন্তের টীকার বীজ নিয়ে যেতে সাইগনে এসেছিলাম বলেছি। সে সমস্ত টীকার বীজের শিশি সমুদ্রের ষ্টিমারের সঙ্গেই ডুবেছিলো। কিন্তু তার ভেতর একটি কবে দেখবার জন্য বার করে ভুলে ওয়েষ্ট কোটের পকেটে রেখেছিলাম মনে নেই। ওপরের কোটটি একেবারে ছিঁড়ে যাওয়ায় একদিন খুলে ফেলে দিলাম। সেদিন ওয়েষ্ট কোটের পকেটে হঠাৎ হাত দিয়ে সেই শিশিটি পেলাম। শিশিটি কিসের বুঝতে পেরে আমার আনন্দের সীমা রইল না। এতদিনকার অমানুষিক অত্যাচারের এইবার শোধ নেব। মরুক এই পিচাশের দল।

আমার কাছে যে টীকার বীজ ছিল, তা শোধন করা নয়। সুমাত্রায় গিয়ে তা আমি শোধন করে ব্যবহার করব বলেই নিয়ে যাচ্ছিলাম। এই অশুদ্ধ বীজের এতটুক একজন দস্যুর রক্তে মিশিয়ে গেলে যে মহামারী স্থরু হবে তা থেকে কেউ বাঁচবে না।

কিন্তু পরমুহূর্তেই বুকের ভেতর কেঁপে উঠল। এ উন্মত্তের মত কি ভাবছি! হাজার হলেও আমি ডাক্তার। মানুষকে বাঁচানই আমার ব্রত, আমি কিনা মৃত্যুর বাহন হয়ে মানুষকে মারতে যাচ্ছি। হোক সে শত্রু, হোক সে অত্যাচারী, চরম উৎপীড়ন সয়েও একাজ যে

আমি করতে পারিনা। তাছাড়া শুধুতো জলদস্যুরা নয়, নিরীহ উৎপীড়িত ক্রীতদাসেরাও যে এই মহারীতে মারা যাবে।

কিন্তু বিধাতার শাস্তি তারা শেষ পর্য্যন্ত পেল, অদ্ভুত উপায়ে।

আমার কাজ ছিল, আর কয়েকজন দাসের সঙ্গে হ্রদের জলে মাছ ধরা। আমরা ছোটো একটা নৌকা নিয়ে সারাদিন হ্রদে ঘুরে ঘুরে জাল ফেলে ফেলে মাছ ধরতাম। একদিন সকালে হঠাৎ প্রথম জাল তুলে অবাক হয়ে গেলাম। আমার সমস্ত জাল, লাল রঙে যেন ছোবান। একটু নজর করে দেখতে, মনে হল, জালময় যেন ছোটো ছোটো লাল কাঁকর উঠেছে এবং পরক্ষণেই দেখলাম সে কাঁকর নড়তে সুরু করেছে। কাঁকর নয় সে কাঁকড়ার ছানা।

এদেশে কোনো কোনো নদীতে বৎসরে এক সময়ে অমনি কাঁকড়ার ছানা হয়। নদী ভরে যায়, আঁচলে করে তুললে তাতে অসংখ্য ছানা কিল বিল করে।

তৎক্ষণাৎ জাল আবার জলে ফেলে দেওয়া হল। তাতে কি হবে? কাঁকড়ার ছানারা সমস্ত নৌকো ছেঁকে ধরেছে। তারা শুধু নৌকোয় উঠেই ক্ষান্ত হয়না—সুড়সুড় করে দলে দলে গায়ে ওঠে। তাদের ঝেড়ে ফেলে দেওয়াই দায়; পাঁচটাকে ঝাড়তে পঞ্চাশটা উঠে পড়ে। তাদের মাড়াতেও কষ্ট হয় কিন্তু না মাড়িয়েও উপায় কি। বুঝতে পারলাম না কোথা থেকে এই সমুদ্রের পঙ্গপাল এল! সমুদ্রের পঙ্গপাল কথাটি তাদের পক্ষে কি রকম যে খাটে সেদিন তা বুঝতে পারলাম।

কিছুক্ষণ বাদে নৌকোয় থাকাও অসম্ভব হল। মাছ তো সেদিন সামান্যই মিলল। তাই নিয়ে পাড়ে উঠে দেখি, পাড়েরও বহুদূর পর্য্যন্ত সেই কাঁকড়ার ছানায় ছেয়ে গেছে।

মাছ না পাওয়ার জন্যে যথেষ্ট উৎপীড়ন অবশ্য সহ্য করতে হয়েছিলো। পরদিন সকালে কিন্তু হ্রদের ধারে গিয়ে অবাক হয়ে গেলাম। তীরের বহুদূরের থেকে দেখা যায় সমস্ত হ্রদের জল রক্তের

মত রাঙ্গা হয়ে গেছে। কাঁকড়াগুলো একদিনেই যেন অনেকটা বড় হয়ে উঠেছে।

আমরা আগের দিন কাঁকড়ার জন্যে মাছ ধরতে পারিনি বলে কৈফিয়ৎ দেওয়ায় একজন দস্যু আমাদের সঙ্গে আমাদের কথা সত্যি কিনা যাচাই করতে এসেছিলো। আমাদের একজন সেই কাঁকড়ার সমুদ্র দেখিয়ে বললে, "কেমন আমরা মিথ্যে বলেছিলাম, ওই কাঁকড়ার ভেতর মাছ পাওয়া যায়"। তার মুখে এক ঘুঁসি মেরে দস্যু বললে—"তাই ধরতে হবে"।

তাই ধরতে গেলাম। কিন্তু হ্রদে পৌঁছতে পারলে ত। তীরের উপরেই কিল বিল করে কাঁকড়ার পাল গায়ের উপর উঠতে থাকে। শুধু গায়ে ওঠে না। তারা বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটু কামড়াতে শিখেছে। কত তাদের গা থেকে ঝেড়ে ফেলা যায়। খানিক দূর গিয়ে বাধ্য হয়ে ফিরলাম। যে দস্যু তদারক করতে এসেছিলো এবারে সে কিন্তু কিছু বললে না।

সত্যিকার বিপদ তার কয়েকদিন পর থেকে শুরু হ'ল। সকাল বেলায় হঠাৎ কিসের কামড় খেয়ে ধড়মড় করে উঠে বসলাম। আমাদের শোবার কোন জায়গা ছিল না। মাঠের ওপর যেখানে সেখানে গরু ঘোড়ার মত আমরা শুয়ে থাকতাম।

উঠে দেখি, চিতি কাঁকড়ার আকারে একটি লাল কাঁকড়া সজোরে দাড়া দিয়ে একটি আঙ্গুল কামড়ে ধরেছে। আশে পাশে আরোও বিস্তর কাঁকড়া ছুটে বেড়াচ্ছে। অনেক কষ্টে সে কাঁকড়াটাকে পা থেকে ছাড়িয়ে উঠে দাঁড়ালাম। এ কয়দিনের মধ্যে কাঁকড়ারা আকারে দ্বিগুণ হয়ে এতদূর এগিয়ে এসেছে দেখে, সত্যিই অবাক হয়েছিলাম।

চারদিকেই কাঁকড়ার পাল। এমন অদ্ভুত ব্যাপারের কথা কখনও শুনিনি বা পড়িনি। প্রকৃতির নিয়মে সব নিম্ন শ্রেণীর প্রাণীরই প্রথমে এই রকম বংশবৃদ্ধি হয়, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত অধিকাংশই মারা যায়। না গেলে পৃথিবীতে মানুষের বাস করা অসম্ভব হ'ত। দস্যুদের দেখলাম

একটা নতুন খেলা জুটেছে, কাঁকড়া মারা। তারা বড় বড় লাঠি নিয়ে কাঁকড়া মেরে বেড়াচ্ছিল। বিকেলের দিকে তাদেরও প্রাণে কিন্তু ভয় না হোক তুশ্চিন্তা দেখা দিল। এই কাঁকড়ার পাল না গেলে রাত্তিরে শোবার জায়গাও যে মিলবে না। হ্রদ থেকে পালে পালে এসে তারা যেখানে যা কিছু আছে সব অধিকার করে ফেলে ছিল। দস্যুদের প্রকাণ্ড ভাঁড়ার ঘরের চারিধারে পঁচিশ জনদাস শুধু কাঁকড়া মারবার জন্যেই মোতায়েন রাখতে হয়েছিল! কিন্তু তারাও হয়রান হয়ে পড়ছিল। ক্রমাগত মেরে মেরে একদল ক্লান্ত হয়ে গেলে, আর এক দল তাদের জায়গা নিচ্ছিল। কিন্তু এত চেষ্টা সত্ত্বেও কাঁকড়ার পালের ভাঁড়ারে ঢোকা বন্ধ করা গেল না।

রাত্রে কোথায় শোয়া হবে সেই হল সবচেয়ে সমস্যা। সমস্ত পাহাড় ঘেরা দ্বীপ কাঁকড়ায় ছেয়ে গেছে। সে দ্বীপে যা কিছু আহার্য্য ছিল, তা প্রায় শেষ করে ফেলে ক্ষুধার জ্বালায় তারা উন্মত্তহয়ে উঠেছে বুঝতে পারলাম। আমরা যে তাদের ভক্ষ্য নয়,—একথা তাদের বোঝান ক্রমশঃ কঠিন হয়ে পড়ছিলো। সে রাত্রে আর ক্রীতদাসে প্রভুতে প্রভেদ রইল না! সবাই যে যার দেহ বাঁচিয়ে আশ্রয় খুঁজতে ব্যস্ত। অনেক কষ্টে একটু খানি পরিস্কার জায়গা, শুয়ে একটু' খানি না ঘুমোতে ঘুমোতেই কাঁকড়ার কামড়ে অস্থির হয়ে জেগে উঠতে হয়। সে কাঁকড়ার শক্ত দাড়া আবার না ভাঙ্গলে ছাড়াবার উপায় সেই। সারারাত এমনি পাগল হয়ে সকালবেলা যে ব্যাপার দেখলাম —তাতে সমস্ত রক্ত জল হয়ে উঠল ভয়ে। একজন দস্যু অনেক রাত্রে অত্যন্ত মদ খেয়ে মাতাল হয়ে বুঝি অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলো। কাঁকড়া তার রক্তাক্ত কঙ্কালটি ছাড়া আর কিছু অবশিষ্ট রাখেনি।

সকাল হলেও বিপদ বাড়ল বই কমল না। আগে শোবার জায়গা পাওয়া তুষ্কর হয়েছিলো। এদিন দাঁড়িয়ে থাকাই তুষ্কর হয়ে উঠল।

সমস্ত দ্বীপ রাঙা হয়ে গেছে কাঁকড়ায়। তারা পাহাড়ে পর্য্যন্ত ক্ষুধার জ্বালায় গিয়ে উঠছে। স্থির হয়ে কোথাও দাঁড়াবার উপায়

নেই। অনবরত গা ঝেড়ে চলে না বেড়ালে তারা কামড় দেবেই—একটি নয় একসঙ্গে পঞ্চাশটি।

সেদিন যে কিভাবে গেল, ভাল করে স্মরণও হয় না। আহার নেই—নিদ্রা নেই, সারাদিন ছুটে বেড়াচ্ছি। কাঁকড়া মেরে মেরে হাত পা অবশ হয়ে গেছে, আর হাতের লাঠি নড়াতেও ইচ্ছা করে না। কোন রকমে একটু নড়ে চড়ে বেড়াবার শক্তিটুকু আছে। সমস্ত দ্বীপে বড় কোন গাছ নেই—থাকলেও এ কাঁকড়াদের হাত থেকে নিস্তার পেতাম না।

সন্ধ্যার সময় পায়ের একটা আঙ্গুল কাটা গেল। কাঁকোড়াটাকে লাঠির বাড়ি মেরে গুড়িয়ে ছাড়ালাম, কিন্তু তার দাঁড়া ততক্ষণ জম্পেশ হয়ে পায়ে বসেছিলো।

আগের রাত্রে মশাল জ্বালা হয়েছিল। এ রাত্রে সমস্ত অন্ধকার। কে মশাল জ্বালবে। কে কোথায় আছে তার খোজ হয়না। কোন উপায় না দেখে অবশেষে পাহাড়ের দিকে ছুটতে শুরু করলাম, সেখানে হয়ত কাঁকড়ার ভীড় একটু হাল্কা হবে ভেবে! কিন্তু সে আশা বৃথা। যতদূর যাই, সেই এক কাঁকড়ার সমুদ্র। তবু যতক্ষণ প্রাণ আছে বুঝবই মনে করে এগিয়ে চললাম। এধারে পাহাড় ঢালু হয়ে উঠেছে। তার গা ময় সেই কাঁকড়ার লাল ছোপ। অনেক উপরে উঠলে হয়তো নিষ্কৃতি পেতে পারি মনে করে ক্লান্ত পদ টেনে টেনে চলতে লাগলাম। পাহাড়ের গায়ে নানা জায়গায় ছোট ছোট গুহা। ওরই একটির মধ্যে শুয়ে নিশ্চিন্ত মনে মরতে পারলেও যেন সুখ পাই মনে হচ্ছিল।

হটাৎ একটা কথা মনে পড়ায় চমকে উঠলাম। এতক্ষণ এই কথাটি মনে পড়েনি —এমনি আমি নির্বোধ! পাহাড়ে গায়ে অজস্র শুকনো ঘাস রয়েছে। একটি ছোট গুহা বেছে, তার ভেতর থেকে কাঁকড়া তাড়িয়ে, যদি গুহা মুখে এই শুকনো ঘাস জড় করে আগুন করতে পারি, তাহলে তো কাঁকড়া ঢুকতে পারে না। জানি সে ক্ষণিকের নিষ্কৃতি। বরাবর সে আগুন বজায় রাখবার মত ঘাস

জোগাড় করতে আমি পারব না—শেষ পর্য্যন্ত কাঁকড়ারা ঢুকবেই, কিন্তু তবু কিছুক্ষণের জন্যে তো নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোতে পারবো—তারপর আসুক মৃত্যু।

সেই আশায় যেন নতুন বল পেয়ে উন্মত্তের মত শুকনো ঘাস সংগ্রহ করে ছোট একটি গুহা খুঁজে তার মুখে জড় করতে লাগলাম। এই ছোট গুহার ভেতরও কাঁকড়া ঢুকছে কিন্তু চেষ্টা করলে তাদের মেরে গুহাটা নিরাপদ করা বোধহয় যেতে পারে। অবশ্য যদি বাইরে থেকে নতুন কাঁকড়া আর ঢুকতে না পারে। ঘাস সংগ্রহ প্রায় শেষ হয়েছে অন্ততঃ চার পাঁচ ঘণ্টা সে ঘাসের আগুন বেশ জ্বলতে পারবে বুঝে গুহার ভেতর ঢুকতে যাব, এমন সময় মাথা ঘুরে গুহার মুখেই ঘাসের ওপর মুখ গুঁজে পড়ে গেলাম। তৎক্ষণাৎ কোমরে ওপর প্রচণ্ড এক কামড় অনুভব করলাম। সঙ্গে সঙ্গে মড় মড় করে কি যেন ভেঙ্গে গেল এবং তারও একটি অংশ দেহে ফুটল বুঝতে পারলাম। এক খামচা পেটের কাছে মাংস সমেত কাঁকড়াটাকে যখন ছাড়িয়ে ছুড়ে ফেলে দিলাম, তখন মনে পড়ল ওয়েষ্ট কোটের পকেটে টীকার বীজের শিশি ছিলো। সেইটাই ভেঙ্গেছে।

সে নিয়ে তখন মাথা ঘামাবার সময় সেই। তাড়াতাড়ি গুহায় ঢুকে অনেক কষ্টে পাথর ঠুকে আগুন জ্বেলে গুহার মুখে শুকনো ঘাস ধরালাম।

ধীরে ধীরে গুহার মুখে আগুনের বেড়া তৈরী হয়ে গেল। বেড়া ডিঙ্গিয়ে কাঁকড়ারা আর ঢুকতে পারবে না।

এইবার ভেতরে কাঁকড়া মারায় মন দিলাম। হাত আর চলে না তবু প্রাণপণে আধঘণ্টা চেষ্টার পর গুহার ভেতরটা নিরাপদ করা গেল। তখন আর দেহের সাড় ছিল না। কাঠের মত পড়ে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি মনে নেই।

যখন উঠলাম গুহার দরজার আগুন নিবে গেলেও ভেতরে তাত ছিল। দেখলাম, বাইরে কাঁকড়া গিজগিজ করলেও ভেতরে তারা ঢুকতে পারছে না। গুহার ভেতর যে শুকনো ঘাস অবশিষ্ট ছিল,

তাই দিয়ে আবার কষ্ট করে আগুন জাললাম। আগুন আর বড় জোর ঘণ্টা দু'এক আমায় বাঁচাতে পারে! তবু সেইটুকুই যথেষ্ট।

সমস্ত শরীরে ভয়ঙ্কর উত্তাপ ও বেদনা বোধ করছিলাম। বেদনা হওয়া আশ্চর্য্য নয়—সমস্ত দেহ অসাড় হয়নি এই আশ্চর্য্য।

কিন্তু গায়ে আমার এসব কি? ঘাসগুলো বেশ ভালো করে জ্বলে ওঠবামাত্র নিজের গায়ের দিকে চেয়ে কেঁপে উঠলাম। আমার সর্ব্বাঙ্গে বসন্তের গুটি বেরিয়েছে। বুঝলাম যে বীজে একদিন দস্যুদের মারবার কল্পনা করেছিলাম—তাই ভাঙ্গা শিশি দিয়ে আমার গায়ে ঢুকে এই রোগের সৃষ্টি করেছে।

প্রথমটা ভয় হচ্ছিল, শেষে মনে হল তাতে আর কি, মরতে তো হতই। বেশীক্ষণ জ্ঞানও রইল না, জ্বরের ঘোরে খানিক বাদে বেহুঁশ হয়ে পড়লাম।

কদিন যে সে অবস্থায় কেটেছিল জানি না না। রোগের মধ্যে কি করেছি না করেছি তাও মনে নেই। সেবার যদি মরতাম, কোনো কষ্ট পেতে হোতনা—আমার জ্ঞান ছিল না।

একদিন সকালে হঠাৎ চোখ খুলে মাথা পরিষ্কার হয়ে গেল। দেহ অত্যন্ত দুর্ব্বল, নড়তে কষ্ট হয়—তবু কেমন যেন ভালো মনে হচ্ছিল। চেষ্টা করে উঠে বসলাম। তার পরই মনে পড়ল সব কথা। কোথায় সে কাঁকড়ার পাল?

গুহা মুখে চেয়ে অবাক হয়ে গেলাম। সেখানে মরা কাঁকড়ার খোলা স্তূপাকার হয়ে গেছে। গুহা মুখে অতি কষ্টে দাঁড়িয়ে দেখলাম, চারিদিকে স্তূপাকার মরা কাঁকড়ার খোলা।

দুর্ব্বল দেহেও প্রাণ রক্ষার জন্যে সব করতে হল। কেমন করে সে পাহাড় থেকে গড়িয়ে নেমেছিলাম, কেমন করে আহার না পেলেও পাহাড়ের খোদলে খোদলে জমা বৃষ্টির জল খেয়ে প্রাণ বাঁচিয়ে ছিলাম, সে সব বর্ণনার দরকার নেই।

খাবার জিনিসের অভাবে ঘাসের দানা খেয়ে থাকতাম। তখন বুঝেছিলাম—মানুষ সব কিছু পারে। দিন চারেক বাদে শরীরে

একটু বল পেলাম। পাহাড় ছাড়িয়ে ক্রমশঃ দস্যুদের বাসস্থানের দিকে অগ্রসর হতে লাগলাম।

সেখানে যে ভয়াবহ দৃশ্য দেখলাম, তা জীবনে ভুলতে পারব না। চারিধারে শুধু মরা কাঁকড়ার খোলা, আর তারই মাঝে মাঝে মানুষের কঙ্কাল। কাঁকড়ারা কেন মরেছে জানিনা কিন্তু সমস্ত মানুষ যে নিঃশেষ করে মরেছে এটা নিশ্চিত। যে জলদস্যুর ভয়ে একদিন ওদিকে সাগরে মানুষের হৃদকম্প হত—তারা এমনি করে নিঃশেষ হয়ে যাবে কে জানত !

এইখানেই আমার গল্প শেষ। সেই ভয়ঙ্কর দ্বীপ থেকে কেমন করে একটি ছোটো নৌকোয় বেরিয়ে বাইরে এসেছিলাম, কেমন করে সেই পথে একটি বাণিজ্য তরী আমায় তুলে নিয়েছিল সে সব কথা বলব না।

এই অদ্ভুত কাহিনী অবশ্য কাউকে বলিনি। বললে তারা আমায় পাগলা গারদে না দিলেও চাকরীতে নিশ্চয়ই রাখতো না। তারা ভাবত এরকম অদ্ভুত স্বপ্ন যে দিনে দুপুরে দেখতে পারে তার নিশ্চয় মাথা খারাপ। তাকে একটা হাসপাতালের কর্ত্তা করে রাখা যায় না।

তাদের বলেছিলাম যে ষ্টীমার ডোবার পর আমি কোন রকমে ভাসতে ভাসতে সেই পাহাড়ের গায়ে ঠেকি। সেখানেই আমায় একটি বাণিজ্য জাহাজ উদ্ধার করে।

গল্প শেষ হয়ে গেলে, সুধীর জিজ্ঞাসা করলে—"আচ্ছা জ্যাঠাবাবু কাঁকড়াগুলো কিসে মরল ?" "তা ঠিক জানিনা তবে আমার একটা অনুমান আছে"।

"কি জ্যাঠা বাবু ?"

শুনলে তোরা হাসবি, তবু বলি—সেই টিকার বীজ থেকেই কাঁকড়াদের ভেতরও মহামারি হয়। আজ কাল করে কোন কোন বৈজ্ঞানিক প্রমান করেছেন যে মানুষের অধিকাংশ রোগ—পশু পক্ষী, এমন কি সমুদ্রের জীবজন্তুদেরও হয়।



রহস্যদ্বীপের — কাহিনী

ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য

বাংলাদেশে অ্যাডভেঞ্চারের পরিবেশ নেই, বাঙালী ছেলের জীবনে অ্যাডভেঞ্চারের সুযোগ নেই—এমনি একটা কথা আমরা ছেলেবেলা থেকে শুনে আসছি। বোধহয় এইজন্যই সেকালের অ্যাডভেঞ্চার গল্পের লেখকেরা তাদের টেনে নিয়ে যেতেন আফ্রিকার দুর্ভেদ্য জঙ্গলে, অষ্ট্রেলিয়ার জনমানবহীন প্রান্তর কিংবা দক্ষিণ আমেরিকার আমাজনের বন্য পরিবেশে। ক্বচিৎ আসামের জঙ্গলেও তাদের নিয়ে যাওয়া হত না এমন নয়, কিন্তু হিমালয়ের কথা বড় একটা কারো মনে পড়ত না। যাই হোক, গল্পের ভেতর স্বাভাবিকতা আনবার জন্যই যে এরকমটা করা হত তাতে সন্দেহ নেই; কিন্তু আমাদের চোখে তাই হয়ে দাঁড়াত অস্বাভাবিক, এমনকি হাস্যকরও বলা যেতে পারে! কারণ ঐ রকম পটভূমিকায় বাঙালী ছেলেদের আমরা কল্পনাও করতে পারতাম না।

কিন্তু দিন-কাল বদলে গেছে। এখন যে-কোন দুর্গম জায়গায় বাঙালী ছেলে কেন, বাঙালী মেয়েদেরও যেতে দেখলে আমরা অবাক্ হই না। আগেকার দিনে যা গল্পচ্ছলেও অবিশ্বাস্য ছিল এখন তা বাস্তব জীবনেই সত্যি হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমার এ কাহিনীর অবতারণাও সেই প্রসঙ্গেই বলা যেতে পারে।

গত কয়েক বছর থেকেই বাংলাদেশে মাছের যেন দুর্ভিক্ষ লেগেছে। দুধ আর মাছ এই দুটিই ছিল বাঙলী পরিবারের বৈশিষ্ট্য। প্রথমটির কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, দ্বিতীয়টির আকাল যেন কিছুতেই বরদাস্ত করা যাচ্ছে না। তাই গভর্ণমেণ্টের টনক নড়েছে, তারা মাছের জন্য খাল-বিল, নদী-পুকুর চষে বেড়াচ্ছেন ; কিন্তু মাছ কই ? অবশেষে নজর পড়েছে সমুদ্রের দিকে। টাটকা জলের মাছ যদি না-ই পাওয়া যায় নোনা জলে তো মাছের অভাব নেই।

কিন্তু ধরে কে ? আর কি করেই বা ধরে ? বাংলাদেশের তলা দিয়ে টল টল করে সমুদ্রের স্রোত বয়ে গেলেও সমুদ্রে মৎস্যশিকারে বাঙালী তেমন অভ্যস্ত নয়। সাজসরঞ্জামের ও অভাব প্রচণ্ড।

এই অসুবিধা দূর করার জন্যই গভর্ণমেণ্ট কয়েকটি চালাক-চতুর ছেলে বেছে নিয়ে এ ব্যাপারে শিখিয়ে পড়িয়ে নেবেন ঠিক করলেন।

সমুদ্রে মাছ ধরার ব্যাপারে এশিয়ার মধ্যে জাপানীরাই বোধ হয় সবচেয়ে অগ্রসর জাত, তাই ঠিক হল এই ছেলেদের কয়েকমাসের জন্য জাপানে পাঠানো হবে।

প্রশান্তও ছিল এই ছেলেদের মধ্যে একজন। সে জুয়লজি অর্থাৎ জীববিজ্ঞানে অনার্স নিয়ে বি, এস-সি পাস করে কি করবে কি করবে ভেবে ঠিক করতে পারছিল না। হঠাৎ কাগজে সরকারী বিজ্ঞাপন দেখে একখানা দরখাস্ত ছেড়ে দিল আর প্রথম চোটেই তার ডাক পড়ল। তারপর একদিন শুভদিন শুভক্ষণে (কিংবা হয়তো অশুভ দিনে অশুভ ক্ষণে) আর কয়েকটি সঙ্গীর সঙ্গে যাত্রা করল সুদূর জাপানে।

অদ্ভুত দেশ জাপান। দেশটাও যেমন বিচিত্র, লোকগুলোও তেমনি। প্রশান্তদের শিক্ষার ভার যাঁর ওপর পড়ল তাঁর নাম ডক্টর কারিকুরা। অত্যন্ত অমায়িক ভদ্রলোক। তা ছাড়া জীববিজ্ঞানে এবং সমুদ্র বিজ্ঞানে তাঁর অসম্ভব জ্ঞান। বহুদিন ধরে সামুদ্রিক মাছদের নিয়ে গবেষণা করেছেন তিনি। সাধারণ লোকে খবর রাখে না এমন দুর্গম জায়গায় অভিযান করেছেন, সমুদ্রের আনাচে–

কানাচে ঘুরে বেড়িয়েছেন। তাঁর সেই বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা ভাঙ্গা ইংরেজীতে প্রায়ই গল্প করতেন তিনি প্রশান্তদের কাছে।

প্রথম কয়েকদিন ডাঙ্গাতেই ক্লাস চলল। তারপর শুরু হ'ল ট্রলার নিয়ে সমুদ্রে শিকার যাত্রা। প্রথমে ছোট ছোট ট্রলারে চেপে উপকূলভাগেই ঘুরে বেড়ানো হ'ত। কোথায় মাছদের থাকার সম্ভাবনা, কি করে তাদের সন্ধান পেতে হয়, কি করে নজর এড়িয়ে তাদের ধরা যায়—এ সব বিষয়ে অল্পদিনের মধ্যেই দলের সবাই পোক্ত হয়ে উঠল। প্রশান্ত মনে মনে ভাবল, দেশে গিয়ে সুন্দরবনের আশেপাশে কি করে চষে ফেলতে হয় তা দেখিয়ে দেব। মাছের অভাব রাখতে দেবে না সে বাংলদেশে।

সপ্তাহ তিনেক ঐভাবে ঘোরার পর কারিকুরা বললেন, "এবার আরও আমাদের বড় জাহাজ নিতে হবে—আরও বড় ট্রলার। কারণ এবার আর আমরা উপকূলের কাছে ঘুরব না—পাড়ি দেব মাঝ সমুদ্রে এক-একটা জায়গা আছে যেখানে বিশেষ মাছ ঝাঁক বেঁধে ঘোরে। কোন কোন ঝাঁকে বিশ হাজার—পঞ্চাশ হাজার—এমন কি লক্ষাধিক মাছও থাকতে পারে। এইরকম একটা ঝাঁকের সন্ধান পেলে আর ভাবনার কারণ থাকে না। ধর আর তোল। তবে সব মাছই অবশ্য মানুষের খাবার উপযোগী নয়। তা ছাড়া ভারী সেয়ানা ওরা। সমুদ্রে ওদের দুষমন বড় বড় জলজীবের তো অভাব নেই। হাঙ্গর আছে, তিমি আছে, আরও কত কি হিংস্র জানোয়ার আছে। তার ওপর আজকাল আবার মানুষেরাও সেই হিংস্র শিকারীদের দল ভারী করছে। কাজেই কি করে আত্মরক্ষা করতে হয় সে বিষয়েও ওরা খুব সজাগ। খুব হুঁশিয়ারীর সঙ্গে এগোতে না পারলে সমস্ত পরিশ্রমই পণ্ড হয়ে যাবে।"

প্রশান্তের এ এক নতুন অভিজ্ঞতা। অনন্ত সমুদ্রের মাঝখানে ছোট্ট একটা মোচার খোলার মত ভাসছে ওরা। ডক্টর কারিকুরা তাঁর যন্ত্রপাতি নিয়ে নানান রকম পরীক্ষা চালাচ্ছেন। কখনও তীব্র আলো ফেলছেন জলে, কখনও ওজন-বাঁধা ধাতুর তার নামিয়ে

দিচ্ছেন। কানে হেডফোন লাগিয়ে পরীক্ষা করছেন শব্দ—যেন অতল জলের মর্মবাণী বুঝে নিতে চান। শিক্ষার্থীরাও একে একে তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করছে। অস্বাভাবিক কিছু ঘটলেই ছুটে এসে খবর দিচ্ছে তাঁকে।

কাল রাত্রে ছোট একটা মাছের ঝাঁক ধরা পড়েছিল, ছোট হ'লেও হাজার দু' তিন মাছ ছিল সেই ঝাঁকে, জাল দিয়ে যখন তোলা হ'ল তখন সে কী উত্তেজনা সবাইকার। কিছু মাছ বেরিয়ে চলে গিয়েছিল কিন্তু যা পাওয়া গেল তারও দাম বড় কম হবে না।

ভারী ভাল লাগছিল প্রশান্তর। কলকাতার বন্ধুরা তাকে ঠাট্টা করে 'জেলে' বলে ক্ষ্যাপালে কি হবে, আসলে সে এখন একজন 'ফিশারি-এক্সপার্ট'। বাংলায় 'ধীবর-রাজ' উপাধি হতে পারে তার। দলের মধ্যে একমাত্র সে-ই বাঙ্গালী। এ ছাড়া তাদের সঙ্গীরা সকলেই প্রায় দক্ষিণ ভারতীয়। কেউ এসেছে কেরালা থেকে, কেউ তুঁতকরি থেকে, কেউ বা তামিলনাদের একেবারে তলার দিক্‌কার বাসিন্দা, একজন সিংহলীও আছে। বাদবাকি সবাই জাপানী—ডক্টর কারিকুরারই সাক্ষাৎ শিষ্য তারা। তা যে যে দেশেরই হোক তারা নিজেদের মানিয়ে নিয়েছিল ভালই। কাজের ফাঁকে ফাঁকে অবসর সময়ে হৈ-হল্লা, খাওয়াদাওয়া, ফুর্তি চলতে লাগল সমানে। এরই মধ্যে একটু ফাঁক পেলে ডক্টর কারিকুরাও এসে জুটতেন। সুরু হ'ত তাঁর জীবনের ব্যক্তিগত নানা অভিজ্ঞতার কাহিনী—যা নাকি উপন্যাসের মতই রোমাঞ্চকর।

বেশ চলছিল সব কিছু। জাপানের মূল ভূভাগ থেকে ওঁরা তখন অনেকটা চলে এসেছেন। কারিকুরার ইচ্ছা আরও সপ্তাহখানেক এইভাবে ঘুরবেন। প্রশান্ত মহাসাগরের দিকে কয়েকটা সামুদ্রিক রেখা,—যাকে বলা হয় 'বেল্ট',—ওঁরা পার হয়ে এসেছেন। আরও কয়েকটা পার হবার ইচ্ছা এবং এরই একটা নাকি নানা জাতের মাছের আড্ডা—প্রায় 'সাংচুয়েরীই' বলা যেতে পারে।

কিন্তু সেদিন বিকেলের দিকে কারিকুরাকে কেমন একটু যেন

উদ্বিগ্ন মনে হল। বারবার ডেকে আসছেন, আবার ক্যাবিনে ঢুকে কি সব নক্সাটক্সা ঘাঁটছেন, ফের আবার আসছেন ডেকে।

প্রশান্ত ব্যাপারটা প্রথমে লক্ষ্য করে নি, লক্ষ্য করেছিল শেষাদ্রি আর অরুণাচলম্। দু'জনেই এসে প্রশান্তকে ফিস্ ফিস্ করে জানাল।

ডক্টর কারিকুরা তখন দূরবীণ দিয়ে দূর আকাশে কি যেন দেখতে ব্যস্ত। মুখের ভাব তাঁর প্রসন্ন নয় মোটেই। একটু পরেই তিনি ওদের কাছে এসে বললেন, "আমাদের খুব সাবধানে থাকতে হবে। মনে হচ্ছে খুব বড় একটা ঝড় আসছে।"

শেষাদ্রি ভয়চকিত কণ্ঠে বলল, "টাইফুন ?"

"সম্ভবতঃ তাই। এ অঞ্চলে ঐটেরই উৎপাত বেশী আর ওইটেই সবচেয়ে মারাত্মক।"

প্রশান্তও শুনল, চীন সমুদ্রে জাপান সমুদ্রে ভয়াবহ টাইফুন-ঝড়ের কাহিনী সে ছেলেবেলায় ভূগোলের বইতে পড়েছে। কিন্তু নিজেকে যে কোনদিন তার খপ্পরে পড়তে হবে, এ কল্পনা সে কোনদিনই করতে পারে নি।

সত্যি সত্যি টাইফুন এসে গেল সমুদ্রে।

ওঃ, সে কি ঝড়! ঢেউগুলো সব পাহাড়ের মত উঁচু হয়ে পর-মুহূর্তে যেন হাজার হাজার টুকরো হয়ে ফেটে পড়েছে। ভূমিকম্পের প্রচণ্ড দোলায় দুলছে চারিদিক। কান-ফাটানো বাতাসের শব্দে আর কিছুই শোনা যাচ্ছে না। সঙ্গে সঙ্গে মুষলধারে বৃষ্টি। এ যেন সেই বাইবেলের মহাপ্লাবনেরই পুনরাবৃত্তি। সেই মহাদুর্যোগে প্রশান্তদের জাহাজখানা যে কোথায় ভেসে চলল তা কারো বুঝবার উপায় রইল না। জাহাজের যাত্রীরা আত্মরক্ষার জন্য খোলের মধ্যে ঢুকে গিয়েছিল, অনেকই সেখানে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ল।

দু'দিন দু'রাত্রি এইভাবে কাটবার পর ঝড়ের বেগ কমে গেল। আকাশ যদিও তখন মেঘলা হয়ে রয়েছে, বৃষ্টিও পড়ছে থেকে থেকে, কিন্তু ঝড়ের তাণ্ডব থেমে গেছে।

সকলের আগে ডক্টর কারিকুরা জাহাজের খোলের ভেতর থেকে

বেরিয়ে এলেন। তাঁর পেছন পেছন প্রশান্ত, শেষাদ্রি—এরাও কয়েকজন উঠে এল।

জাহাজ আর সমুদ্রের ওপর ভাসছে না। একটা ছোট দ্বীপের গায়ে এসে কাৎ হয়ে পড়েছে। জাহাজের ওপরকার অনেক কিছুই ভেসে গেছে। মেরামত করে আবার কবে জাহাজ ভাসানো যাবে তার কিছু ঠিক নেই।

অদ্ভুত ধৈর্য ডক্টর কারিকুরার। তাঁর মুখে ভাবনার চিহ্ন ফুটে উঠলেও চালচলনে কোন বিচলিত ভাব বোঝা গেল না। দলের সবাইকে সাহস দিয়ে তিনি যন্ত্রপাতি নিয়ে তন্ময় হয়ে গেলেন।

এ কোথায় এসেছেন তাঁরা ? প্রশান্ত সাগরের এদিকটায় তো কোন দ্বীপ-টিপ থাকার কথা নয়। আরও দক্ষিণ দিকে গেলে হয়তো ২।৪টে প্রবাল দ্বীপ চোখে পড়তে পারত ; কিন্তু অতটা দূরে যে এই দু'দিনে তাঁরা ভেসে এসেছেন তা মনে হয় না।

যাই হোক দ্বীপে যখন এসে পড়া গেছে তখন আপাততঃ জায়গাটা পরীক্ষা করে দেখা উচিত। বিশেষ করে খাদ্য ও পানীয়ের অনুসন্ধান করাটা হলো প্রধান কাজ। জাহাজে যে খাবার জল ভরা ছিল তার অল্পই বাকি আছে, খাবারও যা ছিল তা দিয়ে বেশী সময় চলবে না। কিছু সমুদ্রের জলে ভেসে গেছে, কিছু ঝড়ে বাতাসে নষ্ট হয়ে গেছে। দ্বীপে কোন খাবার পাওয়া যায় কিনা তাও দেখতে হবে। বুনো ফলমুল, নারকেল গাছ এসব থাকলেও তবু কিছুটা সুরাহা হতে পারে। শিকারযোগ্য কোন জন্তু থাকলে তো কথাই নেই। অবশ্য কাছাকাছি জলে মাছ আছে কিনা তাও দেখতে হবে।

ডক্টর কারিকুরা ধীরে ধীরে জাহাজ থেকে নেমে এলেন, প্রশান্তকে বললেন, "তোমাদের মধ্যে থেকে দু'-তিনজন বরঞ্চ আমার সঙ্গে এস, বাদবাকি জাহাজেই থাক। অজানা জায়গা, সবাই এক-সঙ্গে চলে আসা ঠিক হবে না। যতটা সম্ভব সাবধান হওয়াই ভালো।"

কিন্তু দ্বীপের চেহারা দেখে তাঁরা হকচকিয়ে গেলেন। একটা

লালচে ধূলোর আবরণে সমস্ত দ্বীপ ভর্তি। বড় গাছ বলতে একটিও চোখে পড়ে না—শুধু এধারে ওধারে কতকগুলো শ্যাওলা জাতের কি ছড়িয়ে আছে। তাদেরও গায়ে সবুজের আভা সামান্যই চোখে পড়ে—সমস্ত রং জ্বলে ফ্যাকাসে হয়ে গেছে।

ডক্টর কারিকুরা কয়েক মুঠো ধূলো খুবলে তুলে নিয়ে রুমালে জড়িয়ে পকেটে রেখে দিলেন।

এই সময় হঠাৎ খুব জোরে বৃষ্টি এল, সবাই তাড়াতাড়ি জাহাজে ফিরে এলেন। ডক্টর কারিকুরা যতটা সম্ভব বৃষ্টির জল ধরে রাখবার জন্য নির্দেশ দিয়ে আবার নিজের ঘরে চলে এলেন ধূলোগুলি পরীক্ষা করার মতলবে।

ট্রলারে মাছ ধরার সরঞ্জাম ছাড়াও কিছু যন্ত্রপাতি সব সময়েই মজুত রাখেন তিনি। নতুন কোন জিনিষ পেলেই তা বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে পরীক্ষা করে দেখা তাঁর চিরকালের স্বভাব। যন্ত্রপাতির মধ্যে তাই একটা মাইক্রস্‌কোপও ছিল এবং ঝড়েও সেটা নষ্ট হয়নি।

মাইক্রস্‌কোপের নীচে এক চিমটি ধূলো রেখে গভীর আগ্রহে পরীক্ষা করতে লাগলেন তিনি। যা দেখলেন তাতে অবাক্ হয়ে গেলেন। প্রত্যেকটি ধূলোর কণার গায়ে অসম্ভব সুন্দর সব কারিকুরি। যেন কোন্ অজানা শিল্পী তুলি দিয়ে দিয়ে নিখুঁতভাবে সূক্ষ্ম আলপনা এঁকে রেখেছে ওদের গায়ে। অত ছোট জিনিষ,—যা মাইক্রস্‌কোপ ছাড়া দেখাই যায় না,—তার গায়েও এই রকম কারিকুরি কি করে এল ভাবলেও বিস্ময় লাগে।

একটু পরে বৃষ্টিটা ধরে এল। ডক্টর কারিকুরা তাঁর সেই সঙ্গী কয়েকটিকে নিয়ে আবার বেরিয়ে পড়লেন। বেরিয়ে উপায়ও ছিল না। যা হোক কিছু খাবার খুঁজে বার করতেই হবে। যদি কোন গাছ-টাছ পাওয়া যায় তাই কাটবার জন্য একটা ছোট কুড়ুলও নেওয়া হল সঙ্গে!

কিন্তু সেই লাল ধূলোর মত মাটি আর ফ্যাকাসে শ্যাওলা ছাড়া বিশেষ কিছুই চোখে পড়ল না।

শ্যাওলাগুলো কি খাওয়া যায়! শেষাদ্রি একগাছা শ্যাওলা হাত দিয়ে তুলতে গিয়ে চমকে উঠল। বৈদ্যুতিক শক্ খেলে যেমনটা হয় শ্যাওলা তাকে ঠিক তেমনি এক শক্ খাইয়েছে। শুধু তাই নয়, ওর মনে হ'ল শ্যাওলার তলা থেকে যেন আলোর মত চিড়বিড় করছে। ডক্টর কারিকুরাকে এসে বলতেই তাঁর মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। কিছু একটা অশুভ সম্ভাবনার কথা হয়তো তাঁর মনে উঁকি দিয়ে থাকবে।

প্রশান্ত অরুণাচলম্‌কে নিয়ে একটু দূরে এগিয়ে গিয়েছিল, হঠাৎ দেখা গেল তারা প্রাণপণে ছুটে আসছে। কি ব্যাপার? কি ব্যাপার? তারা নাকি একটা অদ্ভুত জিনিষ দেখতে পেয়েছে, তাই খবর দিতে এসেছে।

"চল, চল, দেখে আসি।" কারিকুরার কণ্ঠে ভয়মিশ্রিত কৌতুহল।

চারজনে সন্তর্পণে এগিয়ে চললেন। সত্যি, এমন অদ্ভুত কোন জিনিষ যে থাকতে পারে তা তাঁরা কল্পনা করতে পারেন নি। প্রায় দশ-বিশ হাত জায়গা জুড়ে একটা বিরাট ফুল পাপড়ি খোলা অবস্থায় পড়ে আছে। টকটকে লাল তার রং, পাপড়িগুলো ঝুমকো লতার মত চারদিকে ছড়িয়ে আছে। কিন্তু এক-একটা লতা প্রায় দড়ির মত মোটা।

কোন ফুল যে এত বড় হতে পারে তা কেউ বিশ্বাস করবে না। কিন্তু এ যে চোখের সামনে ফুটে রয়েছে, বিশ্বাস না করে উপায় কি? কিন্তু আশ্চর্য, ফুলটা মাটির ওপরেই ছড়িয়ে রয়েছে—কোন গাছ বা পাতা-টাতার বালাই নেই, তবে কি কাছে পিঠে অন্য কোন দ্বীপ থেকে জলে ভেসে এসেছে?

ডক্টর কারিকুরা বাধা দেবার আগেই প্রশান্ত একটু ভাল করে দেখবার জন্য আরও কাছে এগিয়ে গেল। দু'টো পাপড়ির মাঝখানে দাঁড়িয়ে পরীক্ষা করতে লাগল ফুলটাকে। পরক্ষণেই তার আর্ত চীৎকারে সকলে চমকে উঠল। ফুলের পাপড়িটা প্রশান্তকে সাপের মত জড়িয়ে ধরেছে—তারপর ক্রমাগত টেনে নিয়ে চলেছে মাঝখানে। অজগর জড়িয়ে ধরলে যেমন অবস্থা হয় প্রশান্তরও সেই অবস্থা।

প্রথমটা সবাই হতভম্ব হয়ে গেলেন, কি করবেন ভেবে না পেয়ে পরমুহূর্তে ডক্টর কারিকুরা হাতের কুড়ুলটি দিয়ে সজোরে আঘাত করলেন প্রশান্তকে জড়িয়ে ধরা পাপড়ির গায়ে। পাপড়িটা তু'টুকরো হয়ে ছিটকে পড়ল। প্রশান্ত তার আলিঙ্গন থেকে বেরিয়ে আসবার জন্য পা বাড়াল।

কিন্তু কোথায় পালাবে ? সঙ্গে সঙ্গে বাকি পাপড়িগুলো প্রায় এক সঙ্গে জড়িয়ে নিল তাকে। প্রশান্তর সাধ্য কি তাদের হাত থেকে উদ্ধার পায় ? ডক্টর কারিকুরা এবার মরি-বাঁচি হয়ে ডাইনে বাঁয়ে ক্রমাগত কুড়ুলের কোপ চালাতে লাগালেন। টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়তে লাগল পাপড়িগুলি। সঙ্গে সঙ্গে তাদের ভিতর থেকে একটা হাল্কা রস বাতাসের বুদ্বুদের মত বেরিয়ে আসতে লাগল। প্রশান্ত কোন রকমে ছুটে বেরিয়ে এল তার মধ্যে থেকে।

দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হয়ে সকলে দৌড় লাগালেন। এবার দেখা গেল—ও রকম ফুল একটা নয়, আরও গোটা ৩।৪ এদিকে ছাড়িয়ে রয়েছে। সবগুলো দেখতে এক রকম নয়। রঙ্গিনও আছে, সাদা ফুলও আছে, কিন্তু আকারে সবগুলিই ওই রকম বিরাট। কোনটাই বেড়ে ১০।১৫ হাতের কম হবে না। বহু কষ্টে ওদের হাত এড়িয়ে সবাই এসে জাহাজে উঠলেন। প্রশান্ত তখন থর থর করে কাঁপছে। তার সারা গা জ্বলে যাচ্ছে যেন! ডক্টর কারিকুরা তাড়াতাড়ি একটা তোয়ালে নিয়ে ওষুধে ভিজিয়ে ওর গা মুছিয়ে দিলেন তারপর শুইয়ে দিলেন বিছানায়।

বৃষ্টিটা আবার ঝেঁকে এল, মেঘে আকাশ রইল ঢেকে। তাবপর সন্ধ্যা হয়ে এল। সে রাত্রে আর কারও জাহাজ থেকে নামবার সাহস হ'ল না।

কিন্তু পরদিনই দেখা গেল আকাশের অবস্থা বদলে গেছে। মেঘ কোথায় উড়ে গেছে, তার জায়গায় জ্বলন্ত সূর্য ঝলমল করছে আকাশে। তার আলোয় সাগরের জল আলোয় আলোময় হয়ে গেছে।

আরও খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে ডক্টর কারিকুরা আবার বেরিয়ে

পড়লেন কয়েকজনকে নিয়ে। প্রশান্ত আজ আর সঙ্গে গেল না। সুস্থ হলেও ডেকেই বসে রইল সে।

ভিজে ধূলোগুলো এরই মধ্যে প্রখর সূর্যের তাপে শুকিয়ে ঝুরঝুরে হয়ে গেছে। আরও লাল দেখাচ্ছে সেগুলিকে। সূর্যের আলো সে ধূলোর গায়ে পড়ে ঠিক্‌রে আসছে যেন ওঁরা সেই ধূলো পার হয়ে এগিয়ে চললেন! কালকের দেখা সেই বিরাট ফুলের সন্ধানে।

কিন্তু গিয়ে দেখেন এ কি কাণ্ড। সমস্ত ফুল কুঁকড়ে-মুকড়ে একেবারে শুকিয়ে গেছে। কোথায় বা তার সেই রংএর বাহার, আর কোথায় বা সেই লালিত্য! বহুদিনের শুকনো ঝরে-পড়া বাসি ফুলের মতই মনে হচ্ছে ফুলটাকে। তা ছাড়া ছিঁড়ে-ফিরে লণ্ডভণ্ডও হয়ে গেছে। যেটুকু আছে তাও যেন আকারে অনেক ছোট হয়ে গেছে।

ডক্টর কারিকুরা একটা লোহার ডাণ্ডা সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন। মাথার কাছটা তার আঁকশির মত। তাই দিয়ে সন্তর্পণে তিনি একটা পাপড়ি টেনে দেখলেন। না, কালকের মত সেই আঁকশিকে আর কেউ জড়িয়ে ধরল না। নিষ্প্রাণ দড়ির মতই পাপড়িটা আঁকশির টানে উঠে এল। এবারে সাহস পেয়ে ডক্টর কারিকুরা আরও কাছে চলে গেলেন ফুলটার। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন ওটাকে। তারপর সবাই ফিরে এলেন জাহাজে।

এদিকে জাহাজ মেরামতের কাজও সুরু হয়ে গেছে। যে ভাবেই হোক, জাহাজ ভাসিয়ে এই দ্বীপ থেকে উদ্ধার পেতে হবে তো! নইলে এই জনপ্রাণীহীন মরা দ্বীপের মধ্যে আর কতদিন টিকে থাকা যায়? সারেঙ্‌রা প্রাণপণে কাজ চালিয়ে যেতে লাগল।

আরও দিন দুই এইভাবে কাটল। তৃতীয় দিনে মনে হ'ল দূরে জলের ওপর কি একটা ভেসে আসছে। কারিকুরা দূরবীণ দিয়ে ভালো করে দেখতে লাগলেন। আবার আনন্দে মুখটা ভরে উঠল তাঁর। মালটানা জাহাজই বটে। একজন গিয়ে তাড়াতাড়ি

মাস্তুলে নিশান টাঙ্গিয়ে দিল। যাতে মালটানা জাহাজটা নিশনা দেখে তাঁদের উদ্ধার করতে আসতে পারে।

মনে হ'ল ওরাও ওঁদের দেখতে পেয়েছে। কারণ জাহাজ ফিরিয়ে তারা এইদিকেই আসতে লাগল।

আধঘণ্টার মধ্যেই ওরা এসে ওঁদের উদ্ধার করল। ট্রলারটাকে আপাততঃ গাদাবোটের মত পেছনে বেঁধে টেনে নিয়ে যাওয়াটাই ঠিক হ'ল। কাছাকাছি যে বন্দর পাওয়া যাবে সেইখানেই ওকে ভাল করে মেরামত করে নিতে হবে।

এই ঘটনার পর প্রায় এক বছর কেটে গেছে। প্রশান্তরা যথাসময়ে দেশে ফিরে এসেছে এবং পরিকল্পনার মত ট্রলার নিয়ে বঙ্গোপসাগরে মাছ ধরার কাজেও লেগে গেছে। এরই মধ্যে আর একবার পরামর্শ নেবার জন্য তাকে জাপানে যেতে হ'ল।

ডক্টর কারিকুরার সঙ্গে দেখা হতেই তিনি সাদরে ওকে জড়িয়ে ধরলেন। ওঁরই অতিথি হয়ে দিন দুই থেকে যেতে বললেন। এবং সেই সময়েই একদিন ওকে শুনিয়ে দিলেন সেই অজানা দ্বীপের রহস্যের কথা।

"ব্যাপারটা আমি কিছুটা ওখানেই আঁচ করেছিলাম, কিন্তু সমস্ত প্রমাণাদি সংগ্রহ না করে কাউকে কিছু বলি নি। দেশে ফিরে এসে কিছুদিন আমি ঐ নিয়ে খুব মেতে গেলাম।

প্রশান্ত মহাসাগরের ওই অঞ্চলে যে ওরকম কোন দ্বীপ আগে ছিল না সে বিষয়ে আমি প্রায় নিঃসন্দেহ ছিলাম। যে মালটানা জাহাজটা আমাদের উদ্ধার করে নিয়ে আসে তার ক্যাপটেনও সেই কথাই বলেছিলেন। তিনি ও পথে আরও অনেকবার পাড়ি দিয়েছেন, কিন্তু ওখানে ও-রকম কোন দ্বীপ কখনও দেখেন নি। সমস্ত ব্যাপারটাই কেমন যেন রহস্যময় মনে হয়েছিল আমার কাছে।

আমার মনে যে সন্দেহ এসেছিল, সেটা নিতান্তই অলৌকিক বলে মনে হবে কিন্তু ও ছাড়া ও রহস্যের আর কোন মীমাংসা হতে পারে বলে আমার মনে হ'ল না।

"সমুদ্রে যখন টাইফুন সুরু হ'ল তখন সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড ভূমিকম্পও সুরু হয়েছিল। ভূমিকম্প না বলে সাগরকম্প বলাই উচিত, কেন না ভূমি আর ওখানে কোথায়? তবে, হ্যাঁ, ভূমি ছিল। সাগরের অতল তলে। জলের স্তর যেখানে সেখানে নিশ্চয়ই মাটি ছিল; কিন্তু সে মাটি তো আমাদের ডাঙ্গার মাটি নয়। তা হলে কি রকম মাটি? যুগ যুগ ধরে সমুদ্রের ওপরে বা ভিতরে যে সব জীবজন্তু মারা পড়েছে তাদেরই দেহাবশেষ অতি সূক্ষ্ম ধূলোর কণার মত গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে থিতিয়ে জমছে গিয়ে সমুদ্রের তলায়। আর তাই দিয়েই তৈরী হচ্ছে ওখানকার মাটি! ডায়াটমের নাম শুনেছ তো, ও হচ্ছে তাই—বা সেই জাতীয় জিনিষ।

ভূমিকম্প সুরু হতেই সাগরের তলায়ও জেগে উঠল সেই কাঁপুনি। হয়তো একসময়ে কাঁপুনিটা অতি প্রবল ভাবেই হয়েছিল, যার ফলে সমুদ্রের তলার খানিকটা অংশ, কে জানে কত নীচেকার, হঠাৎ ঠেলে উঠল জলের ওপরে। আর তারই ফলে হঠাৎ সেখানে গজিয়ে উঠল একটা ছোট্ট নতুন দ্বীপ।

তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে ও দ্বীপের মাটি সাধারণ মাটির মত ছিল না—লালচে ধূলোর মত ছিল সেই মাটি, যা দেখে আমি অবাক্ হয়ে গিয়েছিলাম। তাই খানিকটা মাটি বা ধূলো, যাই বল, আমি খুবলে তুলে নিয়ে এসেছিলাম আর জাহাজে বসেই মাইক্রস্কোপ দিয়ে তা পরীক্ষা করে দেখেছিলাম, আমার অনুমান ঠিক। ধূলোর গায়ে আশ্চর্য কারিকুরি—যা কেবল ডায়াটম জাতীয় ধূলোর গায়েই দেখা যায়! তাহলে এই ধূলো বা মাটি নিশ্চয়ই অতি হালে সমুদ্রের তলা থেকে উঠে এসেছে। পুরানো হলে জীবাণুদের অত্যাচারে তা নিশ্চয়ই অন্যরকম, অর্থাৎ সাধারণ মাটিতে পরিবর্তিত হত। সমুদ্রের তলাকার শ্যাওলাও আমরা দেখেছিলাম—ফ্যাকাশে রং। হবেই তো, বেশী নীচে আর কতটুকু সূর্যালোক যায়? তাই ওই শ্যাওলায় সবুজ কণা কম হবেই।

তারপর সেই অদ্ভুত ফুল। গাছ নেই, ডাল নেই, পাতা নেই,

হঠাৎ মাটির ওপর একটা বিরাট টাটকা ফুল আসবে কোত্থেকে? তখনই বুঝলাম ওটা ফুল নয়, কোন সামুদ্রিক জীব—যা ভূমিকম্পের সময় গভীর সমুদ্র থেকে উঠে এসেছে। সী-অ্যানিমোন নামে এক রকম সামুদ্রিক জীবের কথা তুমি নিশ্চয়ই জান, যাকে চলতি কথায় বলা হয় সমুদ্রের ফুল। দেখতে অবিকল ফুলের মত, চারদিকে সুতোর মত পাপড়ি-ঝোলা এই অদ্ভুত জীবটি এমন কিছু দুষ্প্রাপ্য নয়। কিন্তু কথা হচ্ছে সী-অ্যানিমোন অতি ছোট জীব—ফুলেরই মত ছোট। এত বড় দশ-বিশ হাত বেড়ের সী-অ্যানিমোনের কথা তো কখনও শুনি নি!

"কিন্তু একটু চিন্তা করতেই এ ব্যাপারটারও একটা ব্যাখ্যা পেয়ে গেলাম। সমুদ্রের নীচে প্রচণ্ড জলের চাপ। এই জীবগুলো হয়তো খুবই নীচেকার স্তরে বাস করত। সেখানে ওই রকম চাপে টি কে থাকতেই ওরা অভ্যস্ত। যখন ভূমিকম্পের ঠেলায় ওপরে উঠে এল তখন ওদের ওপরকার জলের চাপ একেবারে কমে গেছে। কোন জিনিষ প্রবল চাপের মধ্যে রেখে হঠাৎ চাপ ছেড়ে দিলে কি হয়। তার ভেতর যদি বাতাস বা গ্যাস, এমন কি কোন রসও থাকে—তাও আয়তনে হঠাৎ ভীষণ বেড়ে যায়। আর ওপরকার আবরণটা যদি ইলাস্টিক বা স্থিতিস্থাপক হয় তা হলে সেটা ফেটে না গিয়ে আকারে অনেকটা ফেঁপে ওঠে! এখানেও নিশ্চয়ই তাই হয়েছি। ওই সী-অ্যানিমোন জাতীয় জলজীবগুলো তো এমনিতেই একটু বড়সড় ছিল, ওপরে উঠে হঠাৎ চাপ কমে যাওয়ায় তাদের ভেতরটা ফেঁপে উঠল; ফলে ছোট্ট জন্তুটা আকারে ফুলে ফেঁপে বিরাট হয়ে উঠল।

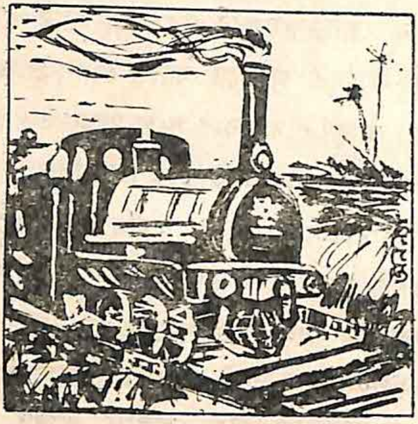
জলের জীব ডাঙ্গায় উঠে বেশীক্ষণ টিঁকতে পারে না। কিন্তু ভাগ্যক্রমে ঐ দিন আকাশ অসম্ভব মেঘলা হয়ে থাকায় সূর্য কিরণ ছিল না বললেই চলে, আর থেকে ক্রমাগত বৃষ্টিও হয় তো ওদের খানিকক্ষণ টিঁকে থাকতে সাহায্য করেছিল। এখন, বেঁচে থাকতে হলেই কিছু খাওয়া দরকার। এই জন্তুগুলোর খাবার পদ্ধতি ভারী

অদ্ভুত। ঐ যে ফুলের পাপড়ির মত সূতোগুলো চারপাশে ঝোলে সেগুলিই হচ্ছে ওদের শিকার সংগ্রহের অস্ত্র। বিজ্ঞানীরা ওকে বলেন টেন্‌ট্যাকলস্‌। কোন ছোট্ট জলজীব ওর কাছাকাছি এলেই ওর ওই টেন্‌ট্যাকলস্‌ দিয়ে তাদের জড়িয়ে ধরে, তারপর ভিতরে টেনে নিয়ে খেয়ে ফেলে। আকৃতি বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে ওদের ওই শুঁড় বা টেন্‌ট্যাকলস্‌গুলোও সেই রকম মোটা হয়ে গিয়েছিল, হয়তো তদনুযায়ী শক্তিও বেড়ে গিয়েছিল তাদের। তুমি যখন পাপড়ি ভেবে ওগুলো নেড়েচেড়ে দেখতে গেলে তখনই পড়ে গেলে ওদের খপ্পরে, আষ্টেপৃষ্ঠে তোমায় জড়িয়ে ধরল অক্টোপাসের মত ওই শুঁড়। ভাগ্যিস আমার হাতে কুড়লটা ছিল, তাই সে যাত্রা তোমাকে রক্ষা করা গল। অবশ্য জন্তুটা যে তোমাকে খেয়ে ফেলতে পারত এমন সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু জখম করতে পারত। তা ছাড়া ওর বিষাক্ত রসও হয়তো মানুষের পক্ষে দারুণ ক্ষতির কারণ হতে পারত।”

ডক্টর কারিকুরা একটু চুপ করলেন। প্রশান্ত সেদিনের কথা মনে করে নিজের অজানতেই একটু কাঁপতে সুরু করেছিল। ডক্টর কারিকুরা হেসে বললেন, “হ্যাঁ, ভাবলে কাঁপুনিই আসে বটে! তবে এখন আর ও নিয়ে চিন্তার কারণ নেই। কারণ পরদিনই রোদ ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ওই জলজীবগুলির মৃত্যু ঘটে। সূর্যের আলোয় দেহের রস শুকিয়ে নেহ কুঁকড়ে-মুকড়ে ফেটে যায়, আকারেও আবার ছোট হয়ে আসে। সেদিন তো আর তুমি দেখতে যাও নি, গেলে নিজের চোখেই দেখতে পেতে।”

“সত্যি, পৃথিবীতে কত কীই যে হতে পারে, তার কতটুকুই বা আমরা জানি!” বলল প্রশান্ত।

“ঠিক বলেছ। সমুদ্র আরও রহস্যময়। তবে ওর সম্বন্ধে হয়তো আমরা আর একটু বেশী জানি অর্থাৎ এইটুকু জানি যে আমরা কিছুই জানি না।”—চায়ের পেয়ালা এগিয়ে দিয়ে হাসিমুখে মন্তব্য করলেন ডক্টর কারিকুরা।



দ্বিতীয় জগত

বিমল কর

অ্যালফ্রেড্ দাদু।

বয়সে বোধ হয় সত্তর পেরিয়ে গিয়েছে, শরীর দেখে বোঝা মুশকিল। রোগা চেহারা, ফরসা রঙ, কট-কটে ফরসা, গায়ের চামড়া শুকনো হলেও ঝুলে পড়েনি। মাথায় দশ পনেরোটা পাকা চুল। চোখে সেকেলে রঙীন চশমা, গগ্‌লস্।

মানুষটার পুরো নাম অ্যালফ্রেড পাঁচুগোপাল মন্‌ডিয়াল। পাঁচুগোপালকে পি জি বলে লেখা হয়, অ্যালফ্রেড পিজি মন্‌ডিয়াল।

অ্যালফ্রেডরা দু পুরুষও পুরোপুরি নয়, দেড় পুরুষ বড় জোর মানভূমের দিকে মণ্ডল বলে পরিচিত ছিলেন। হিড়িকে কৃশ্চান হয়ে যান। মণ্ডল হয়ে যায় মনডিয়াল, যেমন আদরা লাইনের গড়গড়ি সাহেব হয়েছিলেন গ্রেগার।

হিড়িকে পড়ে আর যে যেমনই হোক অ্যালফ্রেড পাঁচু-গোপালদের পরিবারে বারো আনা দিশিভাব বজায় ছিল। মেয়েরা শাড়ি পরতেন, সিঁদুর দিতেন কপালে, পূর্নিমার দিন হরির লুট হত যিশুর নাম করে। এ হল পুরোনো কাহিনী। অ্যালফ্রেড্ তখন বাচ্চা ছেলে দেদার ছেলেকে নিয়ে চাঁদমারিতে শিবাজী আওরঙ্গজেব খেলা খেলে দিন কাটাতেন।

যৌবনকালে অ্যালফ্রেড্ রেলের গার্ড হয়েছিলেন। মালগাড়ীর গার্ড থেকে টপাটপ্ দুটো চারটে প্রমোশান পেয়ে মেল গাড়িতে চড়ে পড়লেন। তাঁর বাঁশি বাজানো, সবুজ ফ্ল্যাগ ওড়ানো ছিল দেখার মতন, যেন সার্কাসের খেলা।

ভাগ্য খারাপ, অ্যালফ্রেডের সাঝ যৌবনে গয়ার কাছে বিরাট অ্যাকসিডেন্ট হয়। মেল ট্রেন নিয়ে যাচ্ছিলেন অ্যালফ্রেড। দুর্ঘটনা ঘটে একেবারে মাঠের মধ্যে। শেষ রাতে। ক্ষতি অনেক হয়েছিল। বিশ পঁচিশ জন সঙ্গে সঙ্গে মারা যায়, ষাট সত্তর জন হাত পা ভেঙে মাথা ফাটিয়ে পড়ে থাকে, একটা ক্যরেজ আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। অ্যালফ্রেড চোট খেয়েছিলেন হাতে পায়ে মাথায়। সবই ধীরে ধীরে ফিরে পান, শুধু চোখই চলে যায়। বলা হতে পারে অন্ধ হয়ে যান-তবে দুটো আশ্চর্য ঘটনা একই সঙ্গে ঘটে যায়।

এই দুটো ঘটনাই অবিশ্বাস্য, কিন্তু সত্য।

অ্যালফ্রেড কোনো কালেই ফরসা ছিলেন না। তাঁর গায়ের রঙ ছিল শ্যামলা। সেই দুর্ঘটনার পর তার গায়ের চামড়া কেমন করে যেন ঝলসে যায় তিনি জানেন না। আগুনে পুড়ে চামড়া ঝলসে সাদা হয়ে গেলে যেমন—অনেকটা সেই রকম ঝলসানি তাঁর গায়ের চামড়ায় লেগে যায়। প্রথম দিকে জ্বালার ভাব ছিল, যন্ত্রনাও করত। দিনে দিনে তা চলে যায়, গায়ের রঙ সাদাটে হয়ে ওঠে। শেষ পর্যন্ত তার রঙ হয়ে দাঁড়ায় কটকটে সাদা।

এই ঘটনা ঘটে—তাঁর চোখ নষ্ট হওয়া। সাধারণভাবে চোখের বিকৃতি কিছু ঘটে নি। অন্য পাঁচজনের মতন তিনি চোখের পাতা খুলে তাকিয়ে থাকেন, তাঁর চোখের মণি নড়ে, তবে ওই পর্যন্ত, তিনি অন্যদের মতন দেখতে পান না। এদিক থেকে অ্যালফ্রেড অন্ধ। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, অ্যালফ্রেডসাহেব বলেন, 'বাইরে আমি অন্ধ, ভেতরে নয়। আমি চোখের তলায় সব দেখতে পাই। কপালের তলায়, দুই চোখের ভুরুর কাছে, জাস্ট ওভার দি নোজ আই ফিল সাম্ স্টেঞ্জড আই।'

পাগলের কথা বলে আমরা এসব উড়িয়ে দিতাম আগে। পরে অনেক কিছু দেখে দেখে বুঝতে পারলাম, অ্যালফ্রেড দাতু এক বর্ণও মিথ্যে বলেন না। এমন কি আমরা ক্যারামের ঘুঁটি যেমন—তেমন করে সাজিয়ে দিয়ে বলেছি, দাতু, রেড ফেলে দিন—ওই পকেটে। তিনটে চ্যান্স।' দাতু ফেলে দিয়েছেন। অদ্ভুত ব্যাপার নয় ?

যাই হোক, পরে দাতুর এই অদ্ভুত ক্ষমতাকে আমরা ভুতুড়ে চোখ বলে স্বীকার করে নিয়েছিলাম অবশ্য দাতু বেশির ভাগ সময় চোখ ঢাকা গগলস্ পরে থাকতেন।

সেই অ্যালফ্রেড্ দাতুকে নিয়ে এই গল্প।

আমি আগের দিন বাড়ি ফিরেছি। গিয়েছিলাম মধ্যপ্রদেশে। কম্পানীর কাজে। আমাদের চামড়া ট্যানিংয়ের ব্যবসা। কম্পানী ছোট নয়। কানপুরে হেড্ অফিস। ছোটখাট অফিস নানা জায়গায়। আমার কাজ ছিল চামড়া সাপ্লায়ারদের সঙ্গে যোগাযোগ করা, কাঁচা চামড়ার ঘাঁটি খুঁজে বেড়ানো। এই ব্যাপারেই ছিদোয়াড়া লাইনের এক জায়গায় যেতে হয়েছিল। বলা যেতে পারে বিশ্রী এক বুনো জায়গায় সেখানে আমি যে তুদিন ছিলাম—কোনো ঘটনা ঘটেনি। আসার পরের দিন এক অগ্নিকাণ্ড হয়। বনে আগুন লাগে। মাইলটাক বন জঙ্গল পুড়ে ছাই। শাল সেগুনের সঙ্গে পশুপাখিও অনেক মারা যায় আগুনে। খবরটা আমি নাগপুরে থাকার সময় কাগজে পড়লাম। তারপর জব্বলপুর হয়ে, অন্য একটা কাজ সেরে নিজের জায়গায় ফিরেছি।

পরের দিনই অ্যালফ্রেড্দাতুর সঙ্গে আমার দেখা। টালির চালের এক বাড়িতে দাতু থাকতেন। পুরনো বাড়ি। বাংলো প্যাটার্নের দেখতে। বাড়ির চারদিকে অল্প কিছু গাছপালা, তুচারটে ফুলগাছ। গেটের সামনে দাতু ছড়ি হাতে দাঁড়িয়েছিলেন।

আমিই এগিয়ে গিয়ে কথা বললাম।

অ্যালফ্রেড দাতু পারিবারিক কথাবার্তা জিজ্ঞেস করলেন তারপর আমার কথা।

আমি ছিদোয়াড়ার কথা বললাম। বলে, আগুন লাগার ঘটনার কথা শোনালাম।

দাত্থ বললেন, "দাঁড়াও, দাঁড়াও কাগজে এ-রকম একটা খবর দু একদিন আগে বেরিয়েছে না?"

"এদিককার কাগজের কথা বলতে পারব না। ওদিক কার সময় কাগজে বড় বড় করে বেরিয়েছে। মাইলটাক না হয়ে যদি আধ মাইল রেড়িয়াস জুড়ে বনে আগুন লাগে—কত ক্ষতি হয় ভেবে দেখুন।"

"এ দিককার ইংরিজি কাগজটায় বেরিয়েছে দু চার লাইন, 'দাত্থ বললেন, "বলি আমায় পড়ে শোনাচ্ছিল।"

পলি দাত্থর ভাইপোর স্ত্রী। চমৎকার মেয়ে। এখান-স্কুলে পড়ায়। ভূগোলের টিচার।

"তুমি তখন ওই জায়গায় কাছাকাছি ছিলে?" দাত্থ জিজ্ঞেস করলেন।

"না। আগের দিন চলে এসেছি। আমি নাগপুরে হোটেলে বসে কাগজ দেখেছি।"

"ও! ···ছিলেনা—ভালই হয়েছে। থাকলে বিপদে পড়তে পারতে।"

"বিপদ আর কী! আমি তো জঙ্গলে থাকতাম না। কোনো ফরেষ্ট কোয়ার্টারেও যদি থাকতাম—আগুন দেখলে চোঁ চোঁ দৌড় মারতুম—।" বলে আমি হেসে উঠলাম।

অ্যালফ্রেড দাত্থ মাথা নাড়তে লাগলেন। মানে আমি মুখে যা বলছি—কাজে তা করতে পারতাম না সহজে।

"তুমি কি কোনো কাজে যাচ্ছ!" দাত্থ বললেন।

"না। এমনি বেরিয়েছি।"

"এসো। এক কাপ কোকো খেয়ে যাও। দুটো কথা বলা যাবে।" দাত্থ কোকোর ভক্ত। চা খান না।

বললাম, "চলুন।"

তখন ঠিক সন্ধে হয়নি ; বিকেল শেষ হবার মুখে। অক্টোবর মাস। তাড়াতাড়ি অন্ধকার হয়ে আসছিল।

দাদুর ঘরে এসে বসলাম। এটা দাদুর বসার ঘর। খুব ছোট। পাশেই তাঁর শোবার ঘর। বসার ঘরের আসবার সামান্য। সবাই পুরনো। ঘরের দেওয়াল ময়লা। মেঝেতে ফাটল ধরেছে। তারই মধ্যে যতটা সম্ভব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে ঘর সাজানো।

বাতি জ্বালিয়ে বসে আমরা দুচারটে সাধারণ গল্প করতে করতে সন্ধে হয়ে গেল। কোকো দিয়ে গেল পলিদি।

"কোকো খাও," দাদু বললেন। তাঁর চোখের গগলস্ খোলা। তাকিয়ে আছেন। মনে হয় আমায় দেখেছেন। বোঝাই যায় না দাদু দৃষ্টিহীন।

তাকিয়ে থাকতে থাকতে অ্যালফ্রেড্ দাদু বললেন, "মিহির, এই জগৎ সম্পর্কে আমাদের ধারণাটা নিজেদের মতন। আমরা যে দেখছি, যা আমাদের বলে দেওয়া হয়েছে, প্রমাণ করে দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে—তার বাইরে আমরা ভাবতে পারি না। কিন্তু এই বিশ্ব শুধু বড় নয়, রহস্যময়! আমি তোমায় একটা গল্প বলব।"

আমি আগ্রহের সঙ্গে তাকিয়ে থাকলাম।

অ্যালফ্রেড দাদুর নস্যি নেওয়া অভ্যেস। নাকের মধ্যে নস্যি ঢুকিয়ে টানেন না, দু আঙুলের ডগায় যে-নস্যিটুকু টিপে রাখেন সেটা নাকের কাছে ধরে আস্তে আস্তে বার কয়েক টানেন।

নস্যি নিয়ে দাদু বললেন, "তুমি কি জান, মানুষের মধ্যে দুটো ক্লাস আছে। সুপিরিয়ার আর ইনফিরিয়ার। অনেক পণ্ডিতদের মত হল, একশোর মধ্যে মাত্র জনা পাঁচেক মানুষ হল উঁচু পর্যায়ের মানে, সুপিরিয়ার। এর মধ্যে আবার একজনের কোয়ালিটি হল পয়লা নম্বরের বাকি চারজন মাঝারিরাও কিন্তু সাধারণ মানুষের চেয়ে বেশি সেন্‌সেটিভ ধরে নাও, একশোটা রেডিয়োর মধ্যে একটা খুব ভাল, চারটে মোটামুটি, আর বাকি পঁচানব্বইটা একেবারে পানের দোকানের রেডিয়ো। ঠিক এই জন্যেই জগতে পাঁচজন

কোনো কোনো আশ্চর্য জিনিসের অভিজ্ঞতা লাভ করে, বাকিরা করে না। তুমি একটু খুঁটিয়ে ভাবলেই এটা বুঝতে পারবে। জগতে জিনিয়াস ফেনামন্‌-এ সবের সংখ্যা কম।

"যা বলছিলাম। আচ্ছা তুমি কখনো মার্কো পোলো, ভাস্কো ডা-গামা, কলম্বাস বা ধরো ওই ধরণের জীবনী পড়েছ? অন্যরাও আছে। এদের জীবনের গল্প পড়লে দেখবে, সবাই এক এক সময় বিচিত্র অবিশ্বাস্য জিনিস প্রত্যক্ষ করেছেন, কিন্তু কোন ঘটনাটা কেন ঘটেছিল তার সদুত্তর দিতে পারেন নি। কেউ দেখেছেন, আকাশের এক দিকে গ্রহণের অন্ধকার নেমে গিয়েছে হঠাৎ, তারপর আবার তা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে; কেউ দেখেছেন, দিনের আকাশ কালো হয়ে অজস্র তারা ফুটে উঠেছে কিছুক্ষণের জন্যে আবার যেমন কে তেমন হয়ে গিয়েছে, আকাশ, কারোও বা মনে হয়েছে, গাছপালা শুন্য দিয়ে হু হু করে উড়ে যাচ্ছে বাতাসে।

"আমি তোমায় নিজের জীবনের একটা গল্প বলি। এই ঘটনার কারণ আমি জানি না। এই ঘটনা না ঘটলে আজ আমি অন্য মানুষ হয়ে থাকতাম, যে অ্যালফ্রেডদাদুকে তুমি দেখছ—সেই দাদু নয়।

"আজকের কথা নয় মিহির, চল্লিশ বছর আগেকার কথা। তখন আমার বয়েস বছর বত্রিশ। আমি বরাবরই ডাকাত গোছের ছেলে ছিলাম। ভয়ডর, দ্বিধা আমার ছিল না। কিছুই গ্রাহ্য করতাম না, একা একাই মহড়া নিতে পারতাম দু চার জনের। এখানকার অনেকেই আমাকে দেখেছে সে-বয়েসে। তা নিজের বীরত্বের গল্প বলে লাভ নেই, আসল কথাটা বলি।

"সেটা নাইটিন ফরটি ওয়ানের কথা। মনে তখন সেকেণ্ড ওয়ালর্ড ওআর চলছে। থারটি নাইনের শেষের দিকে যুদ্ধ লেগেছিল। দু বছর হতে চলল। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট বেহাল হয়ে পড়ছে। কোন দিক সামলাবে বুঝতে পারছে না।

"আমি তখন গার্ড। একটা এক্সপ্রেস গাড়ি নিয়ে যাচ্ছিলাম

কানপুর। প্রথমে ঠিক ছিল মোগলসরাইয়ে গিয়ে আমি ডিউটি অফ্ করব, অন্য কেউ গাড়ি নিয়ে কানপুর চলে যাবে। শেষে আমার ডিউটি পালটে গেল। আমার ঘাড়েই দায়িত্ব চাপল কানপুর পর্যন্ত যাবার।

"আমার স্পষ্ট মনে আছে—দিনটা ছিল এইট্স্ অক্টোবর। সবে একটু ঠাণ্ডা পড়েছে। মাঝ রাতে তো শীত ধরে যায়। তা আমি যে-গাড়ীটা নিয়ে যাচ্ছিলাম—তাতে ভিড় কম ছিল। তখন পুজোর রাশ্ নেই। দেওয়ালির কিছু দেরি।

"তুমি হয়ত শুনেছ, আগে রেলগাড়ির চারটে ক্লাস থাকত। ফার্স্ট, সেকেণ্ড, ইন্টার আর থার্ড।

"আমার গার্ডের গাড়ির সামনে ছিল ব্রেকভ্যান। তারপর একটা থার্ড ক্লাস ক্যারেজ। তারপর ইন্টার আর সেকেণ্ড। আবার থার্ড···। আমরা যখন গোমো হাজারিবাগ কোডারমা দাড়িয়ে গেলাম— তখন বেশ শীত শীত করছিল। মানে ওদিকে শীত পড়তে শুরু করেছে।

"আমার বেশ মনে আছে, হাজারিবাগ রোড্ স্টেশনে আমি ঘড়ি দেখেছি, তিন মিনিট আগে গাড়ি এসেছে। রাত তখন বারোটা বাইশ। এরপর গাড়ি ছাড়ল সময় মতন। আমার কোনো কাজ ছিল না। নিজের কামরায় বসে ফ্লাস্ক থেকে চা বার করে খেলাম! তখন আমি চা খেতাম খুব। চা খেয়ে একটা রবার্ট ব্লেক পড়তে শুরু করলাম। আজকাল রবার্ট ব্লেকের কদর নেই। আমাদের সময় ব্লেক ছিল তোমাদের জেমস্ বণ্ড-এর মতন।

"ট্রেন যাচ্ছে তো যাচ্ছেই—আমার খেয়াল নেই। কোডারমায় গাড়ি এল মিনিট কুড়ি লেট্ করে। কী কারণ বুঝতে পারলাম না। তবে এ-রকম হয়। তখন কয়লার এঞ্জিন। অনেক সময় স্টিম কমিয়ে দেয় ড্রাইভাররা, কিংবা লাইনের গোলমাল বুঝলে স্পিড্ কমিয়ে দেয়, দেখার অসুবিধে হলেও স্লো করে দেয়।—ওটা ওদের ব্যাপার।

"এরপর যখন গাড়ি ছাড়ল, আমি তখন ব্লেককে নিয়ে ছুটছি—অ্যামেলিয়া কার্টারের জন্যে। অ্যামেলিয়া কার্টার—পড়েছ? কী মেয়ে! ঘোল খাইয়ে দিল ব্লেককে।

"হঠাৎ একসময় আমার মনে হল, আমার গাড়ি অনেকক্ষণ থেকে ছুটছে—অথচ কোনো ষ্টেশন পাচ্ছে না। স্টেশন পাচ্ছে না—মানে—কোনো রেল স্টেশনের ওপর দিয়ে যাচ্ছে না। অবাক হবার কিছু নেই মিহির। গাড়ি স্টেশনে ঢুকলেই বোঝা যায়, তুমিও বুঝবে। বড় স্টেশনে ঢোকার সময় বড় ইয়ার্ড দিয়ে ঢোকে, ছোট স্টেশনে ঢোকার সময় ছোট ইয়ার্ড। বা দু একটা লাইনের অদলবদল গাড়ির চাকার শব্দ থেকেই এটা ধরা পড়ে। আবার কান থাকলে স্টেশনে ঢোকার পর প্লাটফর্ম ছুঁয়ে যাবার সময় একটা অন্য শব্দও ধরা পড়ে।

"ব্যাপারটা আমার ভুল। অনেকক্ষণ পরে আবার মনে হল, গাড়ি তো ছুটছে—কিন্তু স্টেশনের পাত্তা পাচ্ছি না কেন? জানলা খুলে বাইরে নজর করতেই দেখি—একেবারে ঘন কুয়াশা। যেন কুয়াশার নদী বয়ে চলেছে। একটা দাগও চোখে পড়ে না। ব্যাপার কী? ট্রেনটাই বা ছুটছে কেমন করে এত কুয়াশায়?

"আশ্চর্য! ট্রেন কি থেমে আছে? থেমে থাকলে চাকার শব্দ, এই ঝাঁকুনি কোথ্ থেকে আসছে?

ঘড়িটা দেখলাম। দেখে অবাক হয়ে গেলাম। ঘড়ি বন্ধ। কাঁটা নড়ছে না।

আমার যে আতঙ্ক হয়েছিল তা নয়, তবে একেবারে বোকা হয়ে গিয়েছিলাম। এসব কেমন করে হয়? গাড়ি চলার শব্দ পাচ্ছি—অথচ গাড়ি যেন চলছে না, কোনো স্টেশন আসছে না। এত কুয়াশা কোন পাহাড় জঙ্গল ভেসে আসছে? গূরপা গুজাণ্ডি তো পেরিয়ে এসেছি অনেক আগে! আমার ঘড়িই বা কেন বন্ধ হল?

পাঁচ রকম কথা ভাবতে ভাবতে আমি আমার কামরার দরজার কাছে এসে দাঁড়ালাম। দরজা খুললাম। আর সঙ্গে সঙ্গে মনে

হল আমি সেই অদ্ভুত কুয়াশার দমকায় ডুবে গেলাম। আর আমার কিছু মনে নেই।

যখন আমার জ্ঞান এল। সামান্য। স্বপ্নের মতন মনে হল—কিছু একটা হয়েছে। চারদিকে কান্নাকাটি, চিৎকার, আগুন, ধোঁয়া, যেন মাঠের মধ্যে ভয়ংকর কিছু ঘটে যাচ্ছে।

এই ঘটনার পর তিন চার দিন আমার জ্ঞান বলে কিছু ছিল না। হাসপাতালে ছিলাম।

"জ্ঞান হবার পর ধীরে ধীরে কিছু খেয়াল করতে পারলাম। বাকিটা পারলাম না। পড়ে একে একে সব শুনতে লাগলাম। আমাদের গাড়ি একটা বিরাট অ্যাকসিডেণ্ট করেছিল। একশো সোয়া'শ লোক ইন্‌জিওরড্। মারা যায় পঞ্চাশ ষাট জন। দু তিনটে ক্যারেজ লাইন থেকে ছিটকে নেমে গিয়েছিল, তার মধ্যে একটা পুড়ে ছাই, অন্যগুলো উলটে গেছে কাত হয়ে। আমাকে লাইন থেকে হাত তিরিশ দূরে মাটিতে পড়ে থাকতে দেখা গিয়েছিল।

"এই হল ঘটনা। যা লোকে শুনেছে, জেনেছে। তোমরাও এর গল্প শুনেছে! কিন্তু আমি যা বলব, এটা তুমি শোনোনি।

"সুস্থ হয়ে ওঠার পর—আমি চোখ হারালাম। আমার গায়ের জ্বালা বছর দুই ছিল। তারপর চলে গেল। মিহির, আমি অনেক ভেবেছি তারপর থেকে—নানাভাবে ভেবেছি—কিন্তু কোনো সদুত্তর খুঁজে পাইনি, কেন কীভাবে এই মারাত্মক অ্যাকসিডেণ্ট ঘটল!

"আমি প্রথম থেকে কতকগুলো কথা বলব—মন দিয়ে শোনো।

"আমার প্রথম কথা হল, আমাদের গাড়ির অ্যাকসিডেণ্ট হবার কোনো সম্ভাব্য কারণ ছিল না। কারণঃ এক—আমাদের গাড়ি আপ্ লাইন দিয়ে ছুটছিল, সামনে কোনো অব্‌স্ট্রাকশান্ ছিল না। এমন কি সেখানে কোনো লেভেল ক্রশিং ছিল না কাছাকাছি। দুই—সাধারণত যেখানে খারাপ বাঁক থাকে মানে লাইন চাঁদের

কলার মতন বাঁক খায়—সেইসব জায়গায় গাড়ি যদি স্পিড কন্‌ট্রোল না করে ঘোরে—অ্যাকসিডেন্ট হতে পারে। অর্থাৎ লাইন থেকে ছিটকে যেতে পারে গাড়ি। তিন—যদি লাইনের ফিশ প্লেট সরিয়ে রাখা হয়। লাইন খুলে নেওয়া হয়। চার—এঞ্জিনের কোনো মেকানিকাল গোলমালের জন্যে। মোটামুটি এগুলোই হল বড় কারণ। আমাদের বেলায়—এর কোনোটাই ঘটেনি। অ্যাকসিডেন্টের পরে যে এন্‌কোয়ারি বোর্ড বসে তাতে বোর্ড কোনো কারণই খুঁজে পায়নি। এমন দূর্ঘটনা ঘটতে পারে বলে বোর্ড বিশ্বাসই করতে পারেনি। তখন বিয়াল্লিশের আন্দোলন শুরু হয়নি যে কেউ লাইন খুলে রাখবে। ...তা হলে ?

"আমি হাসপাতালে শুয়ে শুধু ভাবতাম-- কেমন করে এই দুর্ঘটনা ঘটল। জ্যোৎস্না রাত্রি। নাকের সিধে লাইন। চারদিকে মাঠঘাট—যেমন হয়। দূরে ঝোপছাড় বনজঙ্গল। ফাঁকা মাঠে এমন কাণ্ড হল কেমন করে ?

"আমি তোমায় বলছি মিহির, সাধারণ যুক্তিতে এই অ্যাকসিডেন্টের কোনো কারণ তুমি খুঁজে পাবে না।"

"তবে ?"

"এবার আমি যা বলব, সেটা আমার অনুমান। আমি কোনো দিনই যুক্তি দিয়ে তা প্রমাণ করতে পারব না।

আমার বিশ্বাস, এই ধরনের অ্যাকসিডেন্ট দুটি মাত্র কারণে হতে পারে।

"এক, যদি ওই সময়—ঠিক ওই সময়ে—আচমকা ওই জায়গায় কোনো ভূমিকম্পের ধাক্কা এসে লাগে। এর ফলে চলন্ত গাড়ি ছিটকে যেতে পারে লাইন থেকে। চোরা স্রোতের মতন ভূমিকম্পের চোরা ধাক্কা অনেক সময় লাগতে পারে।

কিন্তু সেসময় ওখানে ওই অঞ্চলে কোনো ভূমিকম্প হয়নি।

"ছোট ধরণের কাঁপুনি—যাকে—কি বলব—ধরো নেগলিজিবল্ ট্রেমার বলা যেতে পারে—তাও হয়নি অন্তত আমি শুনিনি।

"তবে ব্যাপার কী ?"

"এবার আমি যা বলব, তোমার মনে হবে গাঁজাখুরি গল্প বলছি। না, আমি গল্প বলছি না। আমি চেষ্টা করছি—একটা মানে খুঁজে বার করার। কারণ জানাব।

"তোমায় আমি আগেই বলেছি—আমি দুটো জিনিস আগেই লক্ষ্য করেছিলাম।

"এক, গাড়িটা ছুটছিল তো ছুটছিল, কোনো স্টেশনের ওপর দিয়ে গাড়ি যাবার শব্দ পাচ্ছিলাম না।

"দুই, আমার ঘড়ির কাঁটা থেমে গিয়েছিল।

"তিন, আমি বাইরের দিকে তাকিয়ে যখনই কিছু দেখার চেষ্টা করেছি, দেখেছি—ঘন কুয়াশার নদী বয়ে যাচ্ছে। কেন ?

"অনেক ভেবে—এই রহস্যগুলোর একটা কারণ আমি বার করেছি। হয়ত তুমি মানবে না। তবু তোমায় বলি।

"আমার ধারণা, যে কোনো কারণেই হোক, যে ভাবেই হোক—আমরা—আমাদের পুরো ট্রেনটাই কোনো দ্বিতীয় জগতে চলে গিয়েছিল ! মানে এই জগৎ, এই সময় ও ব্যাপ্তির মধ্যে ছিল না। কেউ আমাদের তুলে নিয়ে অন্য কোথাও চলে গিয়েছিল। তার শক্তি নিশ্চয় অদ্ভুত, অবর্ণনীয়। এই শক্তি কী ? আমি জানি না। সময়কে যেখানে থামিয়ে দেওয়া যায়, এই ব্যপ্তিকে যেখানে ফাঁকি দেওয়া যায়—সেটা কী ? ঈশ্বর জানেন। আমি জানি না। কিন্তু আমার ধারণা, আমরা যেমন খেলনার রেলগাড়ি চালিয়ে দি দম দিয়ে, সেই ভাবে গাড়িটা চলছিল হঠাৎ কারও খেয়াল হল, গাড়িটা তুলে নিলো। খপ্ করে লাইনের ওপর থেকে তুলে নিল খেলনার রেলগাড়ির মতন। তারপর আবার একসময় সেটা নামিয়ে লাইনের ওপর রেখে দিল—খানিকটা তফাতে। হ্যাঁ, সেই রকম হতে পারে ! তবে নামিয়ে রাখার সময় যদি অসাবধানে রাখি বা ভুলচুক হয়ে যায়—ট্রেন আর লাইনে থাকবে না। আমার বিশ্বাস এই ধরণের একটা কাণ্ড হয়েছিল।

“মিহির, তুমি বইপত্র ঘাঁটলে নানা অদ্ভুত অদ্ভুত ঘটনার কথা জানতে পারবে। সেগুলোর কোনো অর্থ উদ্ধার করা যায়নি। ঠিক এই রকম ঘটনা, আঠারোশো সত্তর সালে একটা ঘটেছিল বর্মার দিকে। সেটা ঘটেছিল জাহাজ নিয়ে। আবার উনিশশো তেরো সালে গ্রীসের কাছেও এমন ঘটনা ঘটেছিল—সেটা অবশ্য ট্রেন ছিল। আরও হয়ত ঘটেছে—আমি জানি না।

“কী জানি, আমার মনে হয়, আমাদের এই অসীম জগতের মধ্যে—যেখানে সময় হু হু করে বয়ে যায়, যেখানে শূন্যতা চরাচরময় হয়ে আছে—সেখানে কখনো কখনো কোথাও কোথাও কিছু ঘটে যায়। প্রকৃতির খেয়াল বলতে পার। বলতে পার—অজ্ঞাত কোনো কার্যকারণ—যখন কোনো একটা অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটে যায়। নয়ত, এই আমি—কে আমার গায়ের রঙ পাল্টে দিল? আমার গায়ের রঙ পাল্টে গিয়েছে কেন—বলতে পার? কোনো কিছু আমাকে পুড়িয়ে দিয়েছিল। সেটা কী? আমার চোখ অন্ধ হয়ে গিয়েছিল কেন? মাথায় চোট খেয়ে, না, কোনো ঝলসানি লেগে? কেন একটা পুরো ক্যারেজ্ পুড়ে ছাই হয়ে গেল?

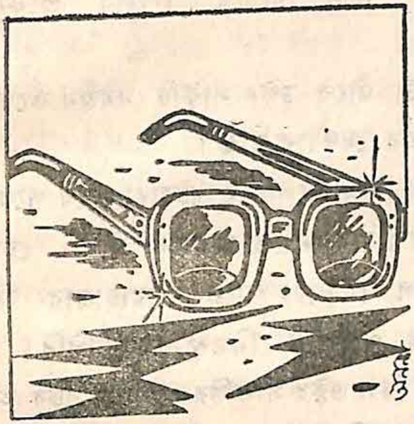
“এসবের কোনো সঠিক জবাব কেউ দিতে পারবে না! মানুষের গায়ের রঙ পালটাতে পারে, চোখ অন্ধ হতেই পারে, একটা বড় অ্যাকসিডেণ্টে রেলের কামরায় আগুণ ধরতেই পারে। হ্যাঁ—সবই পারে। কিন্তু আমি তোমায় বলছি, আমার গাড়ি কোনো স্বাভাবিককারণে লাইন থেকে ছিটকে পড়েনি। অন্য কোনো অস্বাভাবিক কারণ ছিল।

“সেদিন পলি একটা কাগজ এনেছিল। বিদেশী কাগজ তাতে নাকি লিখেছে, আমাদের চারপাশের দৃশ্যমান জগতের কোনো জায়গায় ম্যাগনেটিক ফিল্ডের মাত্রা বেশি। এক এক সময় অজ্ঞাত কারণে এই মাত্রা অত্যধিক হয়ে পঠে। তখন একটা ডিসটারবেন্স হয়। শরীরের ওপরেও তার প্রভাব পড়ে। তবে, আমরা এ ব্যাপার সচেতন নই বলে অন্য কিছু ভেবে নিই। সেই রকম,

আমার বিশ্বাস, আচমকা কোনো অন্য জগৎ আমাদের বাস্তব জগতের মধ্যে ঢুকে পড়েছিল, ঢুকে পড়ে একটা দুর্ঘটনা ঘটিয়ে আবার সরে গিয়েছে।

"তোমার কথাটা এই জন্যে বললাম মিহির, শীতের এই গোড়ায় হুট করে আগুন লাগে না। যদি কেউ শয়তানি করে আগুন ধরিয়েও দেয়—তবু আধ মাইলটাক জায়গা জুড়ে আগুন জ্বলবে এ হতে পারে না। অন্য কোনো কারণ রয়েছে। তুমি তখন আগুন লাগার জায়গায় ছিলে না, ভাল হয়েছে।"





ভয়ঙ্কর কাঁচ/
অদ্রীশ বর্ধন

প্রফেসর নাট-বল্টু চক্র বললেন, এটা সাধারণ চশমা নয়। পরলেই বুঝতে পারবে।

হাতে নিলাম চশমাটা, ফ্রেমটা বাহারি। এ ছাড়া অসাধারণত্ব কিছু দেখলাম না। টেবিলের ওপর একটা খোলা পার্সেলের বাক্স, ওপরে বিদেশী ডাকটিকিট। ইণ্ডিয়ার বাইরে থেকে কেউ চশমাটা পাঠিয়েছে প্রফেসরকে। কেন?

প্রফেসর আবার বললেন—না পরলে বুঝতে পারবে না।

অগত্যা চোখে দিলাম চশমাটা।

অমনি প্রফেসর মিলিয়ে গেলেন। মিলিয়ে গেল তাঁর ল্যাবোরেটরী। আমি দেখলাম, বিক্ষুব্ধ সমুদ্র। বড় বড় ঢেউ। বালিয়াড়ি নুলিয়া। সৈকত ছেয়ে আছে স্নানার্থীদের ভিড়ে। ছুটছে, জলে ঝাঁপ দিচ্ছে, ঢেউ আছড়ে পড়ছে, কিন্তু কোনো শব্দ নেই।

এ জায়গা আমার চেনা। পুরী।

স্তম্ভিত হয়ে চশমা খুললাম। আবার দেখলাম প্রফেসরকে। সেই ল্যাবরেটরী।

—এ কি টেলিভিশন চশমা?

—না, দীননাথ' স্ফটিক চশমা।

—কে পাঠিয়েছে? কার তৈরী?

ডক্টর সাকুচি—একটা চিঠি এগিয়ে দিলেন প্রফেসর। পড়লাম।

জাপান সমুদ্রের একটা দ্বীপে ডক্টর সাকুচি নেমন্তন করেছেন প্রফেসরকে তাঁর স্ফটিক শহর দেখবার জন্যে।

উড়ো জাহাজের জানলা দিয়ে জাপানের চেহারা দেখে পুরোনো কথা মনে পড়ে গেল। জাপান মানে তো চারখানা দ্বীপ। হোনস্থ দ্বীপের ওপর মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে বারোহাজার তিনশ পঁচানব্বই ফুট উঁচু ফুজিয়ামা পাহাড়। নিভন্ত আগ্নেয়গিরি। এর সানুদেশে ছোট্ট ল্যাবরেটরী ছিল ডক্টর সাকুচির। তিন বছর আগে সেখানে বিশ্বের তাবড় বৈজ্ঞানিকদের ডেকে পাঠিয়ে ছিলেন তাঁর 'ডেথ-রে' দেখানোর জন্যে।

ডেথ-রে'—মৃত্যুরশ্মি। সিনেমা প্রোজেক্টরের মত মেসিন থেকে নীল আলো গিয়ে পড়েছিল মেঝেতে। একটা খাঁচার দরজা দরজা খুলে দিতেই গিনিপিগ, খরগোশ আর সাদা ইঁদুর টপাটপ লাফিয়ে নেমেছিল নীল রশ্মির মধ্যে। প্রাণীগুলো কিন্তু কয়েক ফুটের বেশী যেতে পারে নি—লুটিয়ে পড়েছিল নিষ্প্রাণ দেহে।

দেখে চক্ষু চড়কগাছ হয়ে গিয়েছিল পণ্ডিতদের। প্রফেসর নাটবল্টু-চক্র কিন্তু হঠাৎ একটা বিচ্ছিরি কাণ্ড করে বসলেন। খপ করে একটা মরা ইঁদুর তুলে নিয়েই ভোঁ দৌড় দিয়েছিলেন বাইরে। পেছন পেছন দৌড়েছিলেন ডক্টর সাকুচি। একটা মরা ইঁদুর নিয়ে তাঁর এত উদ্বেগ কেন, তখন বুঝিনি।

বুঝলাম পরের দিন। খবরের কাগজের রিপোর্টারদের ডেকে পাঠালেন প্রফেসর। জোচ্চুরি ধরিয়ে দিলেন। সাকুচি নাকি আগেভাগেই মাত্রামত স্ট্রিকনিন ইনজেকশন দিয়ে রেখেছিলেন খরগোশ, ইঁদুর আর গিনিপিগের দেহে খাঁচার মধ্যে বেঁচে থাকলেও যেই বাইরে এসে দৌড়ঝাঁপ করছে—দ্রুত হয়েছে বিষক্রিয়া—লটকে

পড়েছে মাটিতে। মরা ইঁদুরকে কেটেকুটে স্ট্রিকনিন পেয়েছেন প্রফেসর।

সারা পৃথিবীতে ঢি ঢি পড়ে গিয়েছিল প্রতারক সাকুচির কীর্তিকাহিনী নিয়ে। ছিঃ ছিঃ! ঠকিয়ে যে বিখ্যাত হতে চায়, সে আবার বৈজ্ঞানিক হতে পারে নাকি!

সেই থেকে মুখ দেখাদেখি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল দুই বৈজ্ঞানিকের। তা সত্ত্বেও সাকুচি নেমন্তন্ন করেছেন প্রফেসরকে এবং প্রফেসরও ছুটেছেন স্ফটিক শরর দেখতে।

সাকুচির আর এক ধাপ্পাবাজি দেখার জন্যে প্রফেসরের এত উৎসাহ কেন? বুঝতে পারলাম না।

জাপান সমুদ্রের অজ্ঞাতনামা দ্বীপটিতে নির্বিঘ্নে পৌছোলাম স্পীডবোট চেপে। ব্যবস্থায় ত্রুটি নেই সাকুচির।

তখন রাত হয়েছে। দূর থেকে দেখলাম সমুদ্রের খানিকটা জায়গায় সূর্যের আলো। রোদ্দুর ফুটফুট করছে সেখানে। অথচ আকাশ কালো—সূর্য নেই।

কপাল কুঁচকে চেয়ে রইলেন প্রফেসর। দ্বীপে নেমে দেখলাম, সমুদ্রের ধার থেকেই উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। ইস্পাতের ফটকে অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে শান্ত্রী। পাঁচিলের আড়ালে রোদ্দুর ঠেলে উঠছে আকাশপানে আকাশ থেকে নীচে নামছে না।

প্রফেসর মৌন হয়ে গেছেন। আমিও হাঁ হয়ে গিয়েছি ফটক পেরিয়ে। ঝকঝকে রাস্তায় দুধারে সারি সারি ল্যাম্পপোস্ট। কিন্তু খুঁটির মাথায় আলোর বদলে শুধু একটা গোলকাঁচ। সূর্যের মত জ্বলছে কাঁচগুলো। তাকানো যায় না।

দ্বীপটা ছোট! সুরক্ষিত। গাড়ী এবং বাড়ীর সংখ্যা কম। কিন্তু প্রতিটি গাড়ী ও বাড়ী সূর্যের মত জ্বলছে। আমরা এসে পৌছোলাম একটা মস্ত গম্বুজওয়ালা বাড়ীতে। সে বাড়ীর গা থেকেও যেন রোদ্দুর বেরোচ্ছে। সাকুচি মোলায়েম হেসে আমাদের অভ্যর্থনা করলেন। ওর তির্যক চোখে আর হলদেটে

মুখে কিন্তু পুরোনো বিদ্বেষ দেখলাম না।

শুধু বললেন—প্রফেসর, চশমার রহস্য ধরতে পারলেন ?

অর্থাৎ চশমার মধ্যে কিছু বুজরুকি পেলেন ?

চোখ কুঁচকে তাকিয়ে প্রফেসর বললেন—ওটা কি দিয়ে তৈরী ?

—কাঁচ দিয়ে।

—কি কাঁচ ?

অদ্ভুতভাবে চেয়ে রইলেন সাকুচি। আস্তে আস্তে বললেন—স্লো কাঁচ।

পরের দিন গম্বুজঘরে আমাদের নিয়ে গেলেন সাকুচি। বিশ্ব-বিখ্যাত ভণ্ড বৈজ্ঞানিক। কিন্তু আচরণে অসীম আত্মপ্রত্যয়।

বিজাপুরের গোল গম্বুজের মত বিরাট গম্বুজ। ওপর থেকে নীচ পর্যন্ত শুধু কাঁচ দিয়ে মোড়া। অন্ধকার কাঁচ—আলোর প্রতিফলন নেই।

ঠিক মাঝখানে বসলাম আমরা অনেক যন্ত্রপাতি সেখানে। সাকুচি অমায়িক হেসে বললেন—প্রফেসর, আপনাকে আমি এবার বরফের দেশে নিয়ে যাবো। সেখান থেকে মেঘের ওপারে। তার-পর সমুদ্রের তলায়।

—সিনেমা ?

—আজ্ঞে না। স্লো কাঁচ।

—মানে ?

মানে, যে কাঁচের মধ্যে দিয়ে আলো যায় খুব আস্তে।—বলেই ঘর অন্ধকার করে দিলেন সাকুচি। অমনি গম্বুজের ওপর থেকে মেঝে পর্যন্ত দেখলাম মেরু অঞ্চলের বরফঢাকা দৃশ্য। আমি যেন বরফের দেশে বসে রয়েছি। অথচ কোনো প্রোজেক্টর নেই, কোনো প্রোজেক্টর নেই, কোনো আলোকসম্পাতও নেই।

পরক্ষণেই মেরুদৃশ্য অদৃশ্য হয়ে গেল। আমরা এখন মেঘের ওপরে, সবুজ পৃথিবীর ওপরে উঠে গেছি। যেন স্যাটেলাইটে বসে বেগে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করছি

দৃশ্যগুলো কিন্তু দেয়ালমোড়া কাঁচ ফুড়ে বেরিয়ে আসছে। ভারী আশ্চর্য তো! জোচ্চুরিটা ঠিক কোথায়, কিছুতেই ধরতে পারছি না।

হঠাৎ দেখলাম, আমরা সমুদ্রের তলায়। ভয়ে আর একটু হলে চেঁচিয়ে উঠেছিলাম আমি। মাথার ওপর, আশেপাশে শুধু জল আর জল—গভীর জল। সূর্যের আলোও যায় না সেখানে। জলজ উদ্ভিদ, রঙিন প্রবাল আর অদ্ভুদ মাছের সারির মধ্যে থেকে সহসা কিলবিল করে এগিয়ে এল অনেকগুলো দানবিক শুঁড়।

স্কুইড! অপার্থিব চাউনি নিবদ্ধ আমাদের দিকে। দপ করে জ্বলে উঠল ঘরের আলো। দেওয়ালের কাঁচ আবার অন্ধকার হয়ে গিয়েছে। মিটি মিটি হাসছেন সাকুচি।

বললেন বিমূঢ় প্রফেসারকে—এবার আর স্ক্রিকনিনের জোচ্চুরি নয়, এই কাঁচ দিয়ে আমি ভুবন-বিখ্যাত হব। কি করে? বললাম না, এ কাঁচ দেখতে স্বচ্ছ মনে হলেও স্বচ্ছ নয়। এর ভেতর দিয়ে আলো যায় খুব আস্তে। রাস্তায় যে নকল সূর্য দেখলেন, ওগুলো সারাদিন সূর্যের আলো শুষে নিয়েছে, ছাড়বে সারারাত ধরে। যে চশমাটা আপনাকে পাঠিয়েছিলাম তা দিয়ে পুরীর দৃশ্য দেখা হয়েছে তিনমাস আগে। পুরো দৃশ্যটা কাঁচের মধ্যে দিয়ে এপাশে আসছে তিনমাস পরে। এই মাত্র দেওয়ালে কাঁচের গায়ে যে ছবি দেখলেন, তাও ঐভাবে ধরে আনা হয়েছে। কাঁচগুলো রাখা হয়েছিল বরফের দেশে, পাঠানো হয়েছিল পৃথিবীর বাইরে স্যাটেলাইটের ওপর, ডুবিয়ে রাখা হয়েছিল সমুদ্রের তলায়। ঠিক ক্যামেরার মত ছবি উঠে গেছে ওতে। অথচ ওটা ক্যামেরা নয়, শুধু কাঁচ—বিশেষ স্ফটিক।

প্রফেসর নাট-বল্টু-চক্র শুধু একবার ঢোঁক গিললেন। বেশ বুঝলাম, মাথা ঘুরে গিয়েছে তাঁর।

খুশী হয়ে বললেন সাকুচি—বাড়ী আর গাড়ী থেকে কেন রোদ বেরোচ্ছে জানেন? যে রঙ মাখিয়েছি, তার মধ্যেও আছে এই

স্ফটিক পাউডার। সারাদিন সূর্যের আলো সঞ্চয় করেছে, ছাড়ছে সারারাত। প্রফেসর, এখন থেকে কেউ আর ক্যামেরা কিনবে না। আমার এই স্লো কাঁচই তো ক্যামেরা। দেখবেন?

বলেই, একটা চৌকোণা প্রিজম্ প্রফেসরের মাথার পেছনে ধরলেন সাকুচি। তারপর নিয়ে এলেন সামনে। দেখলাম, প্রফেসরের টেকো মাথা আর ঘার-ফাটা পাঞ্জাবির ফটো তার মধ্যে।

প্রফেসর দেখলেন এবং আর একবার খাবি খেলেন। আচ্ছা জব্দ হয়েছেন সাকুচির হাতে। কোনমতে বললেন কাষ্ঠ হেসে—কাঁচের মধ্যে ছবিগুলো তাহলে যখন খুশী বার করা যায় না?

—ভাল প্রশ্ন করেছেন। এতদিন তা পারি নি। বসে থাকতে হয়েছে কাঁচ ফুঁড়ে ছবি ফুটে ওঠার প্রতীক্ষায়। কিন্তু এখন পারি।

—কি ভাবে?

সেইটাই আমার মন্ত্রগুপ্তি প্রফেসর।—গুঢ় হাসলেন সাকুচি—আমি রেগুলেটর দিয়ে কাঁচের মধ্যে বন্দী দৃশ্যগুলো ঠেলে বার করে আনতে পারি আস্তে আস্তে অথবা একনিমেষে। দেখবেন?

বলে কলকজায় হাত দিলেন সাকুচি। আমি এতক্ষণ স্রেফ হকচকিয়ে চেয়ে ছিলাম ভদ্রলোকের সুন্দর মুখের পানে। সুপ্রাচীন মিনামোটো ফ্যামিলির ছেলে তো, খানদানী চেহারা।

একটু হেঁট হয়ে কি যেন করছেন সাকুচি। হঠাৎ অ্যাপারেটাসের ফাঁক দিয়ে পলকের জন্য দেখতে পেলাম ওঁর মুখটা। সে মুখ ক্রুর, কুটিল এবং ভয়ংকর কিছুক্ষণ আগের অমায়িক হাসির লেশমাত্র নেই।

চোখের ভুল না তো? সাকুচি আমার দিকে পেছন ফিরে কি যেন তুলে নিয়ে চোখে লাগালেন। তারপর ঘুরে দাঁড়াতেই দেখলাম, ঘোর কালো কাঁচের চশমা পরেছেন। পাতলা ঠোঁট দুটো ইস্পাতের ঠোঁটের মত চেপে বসেছে হলদে দাঁতের ওপর।

বললেন চিবিয়ে চিবিয়ে—প্রফেসর নাট-বল্ট্-চক্র, ইহজন্মে যাতে আর কারো জোচ্চুরি ধরতে না পারেন, সেই দৃশ্যই দেখুন এবার।—বলেই হাত দিলেন একটা নিকেল-করা হাতলের ওপর।

জবুথবু প্রফেসরের হাতে-পায়ে যে এত বিদ্যুৎ সঞ্চিত ছিল, জানতাম না। চোখের পলক ফেলার আগে উনি ছিটকে গেলেন সাকুচির পানে। সবেগে চড় মারলেন তাঁর চোখের কালো চশমার ওপর। এবং পরমুহূর্তেই দৌড়ে এসে আমার মুখটা নিজের বুকের মধ্যে গুঁজে ধরে আমার ঘাড়ের ওপর নিজের মুখটা চেপে ধরলেন।

সঙ্গে সঙ্গে একটা তীক্ষ্ণ আর্তচীৎকার শুনলাম। সাকুচির হাহাকার। প্রফেসরের বুকের মধ্যে মুখ লুকোনো থাকা সত্ত্বে আমার চোখ ধাঁধিয়ে গেল অবর্ণনীয় অবিশ্বাস্য একটা দীপ্তিতে—যেন লক্ষ সূর্য একসাথে দপ করে জ্বলে উঠেই নিভে গেল ফুস করে।

প্রফেসর ছেড়ে দিলেন আমাকে। হাঁপাচ্ছেন তিনি। সাকুচির হাত সেই লিভারটার ওপর কালো চশমা মেঝেতে।

সোজা সামনে তাকিয়ে আছেন সাকুচি চোখের পাতা পড়ছে না—মণি নড়ছে না।

অকস্মাৎ উত্তেজনায় গলা ভেঙে গিয়েছিল প্রফেসরের। বললেন থেমে থেমে দম নিয়ে।

—সাকুচি, স্লো কাঁচের মধ্যে কবছরের রোদ জমা ছিল? এক বছরের, না তিন বছরের?

নিরুত্তরে স্খলিত চরণে এগিয়ে এলেন সাকুচি, দুহাত সামনে বাড়িয়ে হাতড়াচ্ছেন অন্ধের মত।

প্রফেসর আমাকে টেনে আনলেন ওঁর নাগালের বাইরে। বললেন—এত বিদ্বেষ জমা ছিল তোমার মনে? প্রতিহিংসায় পাগল হয়ে কয়েক বছরের জমা সূর্যের আলো একনিমেষে বার করে দিয়ে অন্ধ করে দিতে চেয়েছিলে আমাকে? ছিঃ সাকুচি! তুমি না বৈজ্ঞানিক?

চকিতে বুঝলাম সাকুচি অন্ধের মত কেন হাতড়াচ্ছেন।

কারণ, উনি নিজেই অন্ধ হয়ে গিয়েছেন! কালো চশমা পরে নিজের চোখকে বাঁচিয়ে উনি আমাদের চোখ নষ্ট করতে গিয়েছিলেন, পারলেন না প্রফেসরের প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের জন্যে।

দু পা এগিয়ে এসে বিকৃত বিকট স্বরে বললেন সাকুচি—কোথায়, কোথায় তুই···গলা টিপে যদি না মারি তো—

অন্ধ মানুষের এত রাগ ভাল নয় সাকুচি।—আর একটু সরে এসে বললেন প্রফেসর—তার চাইতে বরং স্লো কাঁচের ফরমূলাটা যদি বলো, তাহলে সারাদিনের ফোটো দিয়ে কনট্যাক্ট লেন্স বানিয়ে দেব তোমায়—রেটিনায় একটু চিড়ে দেব। আজকের দৃশ্য তুমি কালকে দেখতে পাবে অন্ধ হয়েও। রাজী?

রাজী হয় নি সাকুচি। স্ফটিক ফরমূলাও ফাঁস করেনি।





ফাঁদ

সমরজিৎ কর

লোকে বলে না, ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে? জানতাম না, শেষ পর্যন্ত আমার অবস্থাও হবে একই রকম! ব্যাপারটা নিয়ে কি হৈ চৈ না শুরু হয়ে গিয়েছিল। বনবিভাগের বড় কর্তা, মানে নকুলেশ্বর বাবুর তো মাথায় হাত। না পারেন গিলতে, না পারেন ওগলাতে। ব্যাপারটা আমার কাছেও মনে হয়েছিল একটা বড় রকমের ধাঁধা। কিন্তু বরাত বলেও তো একটা কথা আছে? শেষ পর্যন্ত ভুলটা করে বসলো মধু সারেং নিজেই। আমাকে নেমন্তন্ন করাটাই শেষ পর্যন্ত হলো ওর কাল।

তা হলে গোড়া থেকেই বলি?

প্রতি বছর সেপ্টেম্বর এলেই মনটা আমার উড়ুক্কু হয়ে ওঠে। তা কাজের চাপে সারা বছর হিমশিম খাই। একা মানুষ। সেপ্টেম্বর পড়লেই কলকাতা আর নয়, বাবা। চলো অন্য কোথাও। যেখানে শহরের ভিড়ভাট্টা নেই। একেবারে প্রকৃতির কোলে। যখন কোথায় যাই ভাবছি, এমন সময় পুরনো বন্ধু নকুলেশ্বর বাগের চিঠি পেলাম। নকুলেশ্বর আমার চেয়ে বছর পাঁচেকের বড়। তবে সম্পর্কটা বন্ধুরই বলবো। লিখেছেন, এখন তো আমি অরুণাচলের

হাফোলিতে আছি। চমৎকার জায়গা। তোমার ভালো লাগবে। কলকাতা থেকে ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইনসের প্লেনে গৌহাটি চলে এসো। সেখান থেকে বায়ুদূতের প্লেনে উত্তর লখীমপুর! কবে আসছো জানালে এয়ারপোর্টে জীপ নিয়ে আমি অপেক্ষা করবো। উত্তর লখীমপুর থেকে হাফোলি জীপে ঘণ্টা আটেকের পথ।

নকুলেশ্বর বনবিভাগের বড় কর্তা। পুরো অরুণাচলের বনজঙ্গলের খোদ বড় কর্তা। বনজঙ্গল আমি চিরদিনই ভালবাসি। অতএব—চলো হাফোলি।

উত্তর লখীমপুরের বিমান বন্দরে নামতেই—যাক্ তা হলে এলে। বলেই উচ্ছাসে আমাকে জড়িয়ে ধরলো নকুলেশ্বর। দেখলাম, বয়েস বাড়লেও সে আগের মতই ছেলেমানুষ থেকে গেছে। শোন, সে বললে—তোমার বেড়ানর সব ব্যবস্থা পাকা। ফরেস্ট বাংলোর রক্ষকদের জানিয়ে দিয়েছি—

তা কোথায় কোথায় যাচ্ছি? মাঝ পথে তাকে থামিয়ে দিয়ে প্রশ্ন করলাম আমি তো ওর মন জানি। বাধা না দিলে ওর কথার ফুলঝুরি থামাবে না। আর শেষ পর্যন্ত দেখা যাবে, আসল কথা ছাড়া সবকিছুই সে বলে চলেছে।

কেন? অনেক জায়গাতে যাবে? আলং, দলাই, কাবু, তিরাপের নামচিক, নামফুজ, নামসাং. কামেং-এর রুপা, টেংগা এবং লোহিতের লালপানি, তেজু—বলে চললো সে।

একেবারে এলাহি কাণ্ড! কি বলে যে তোমাকে ধন্যবাদ দেব—

ধন্যবাদ? কি যে বল তুমি—যাকে বলে—

কথা শেষ করলো না নকুলেশ্বর। মাঝ পথে থেমে গেল।

পরিষ্কার দেখলাম, হঠাৎ কেমন যেন গম্ভীর হয়ে উঠল। তার দৃষ্টি অদূরে দাঁড়িয়ে থাকা একটি লোকের উপর নিবদ্ধ।

কি হলো? বিস্ময় প্রকাশ করলাম আমি।

দেখলাম, সেই লোকটি আমাদের দেখতে পেয়ে আমাদের দিকেই এগিয়ে আসছে।

পাজির পা ঝাড়া। অস্ফুট কণ্ঠে কথা বললো নকুলেশ্বর।

এই যে, স্যার। নোমোস্কার। কোথায় যাচ্ছেন বুঝি?

লোকটি এসে একগাল হেসে দাঁড়াল নকুলেশ্বরের সামনে। আড় চোখে আমাকেও সে এক পলক দেখে নিল, সেটাও বুঝতে অসুবিধে হলো না।

ভালো করে আমি লোকটিকে দেখে নিলাম। বছর চল্লিশ বয়েস। তামাটে রঙ এক গাল দাড়ি। বেঁটে খাটো এবং গাট্টা-গোট্টা চেহারা। চোখ দেখলেই বোঝা যায় শেয়ালের মত ধূর্ত। পরনে কালো রঙের ট্রাউজার। গায়ে নীল রঙের পুরু কোট।

নকুলেশ্বর বেশ বিরক্তির সঙ্গেই কথা বললো, কি খবর, মধু? তুমি এখানে?

এই একটু এসেছিলাম, স্যার। এক বন্ধু কলকাতা গেল কিনা। তাকে প্লেনে তুলে দিতে এসেছিলাম—তা নতুন এক স্যারকে দেখছি? বেড়াতে এলেন বুঝি? মধু আমার দিকে চেয়ে মুচকি হাসলো।

হ্যাঁ, আমার বন্ধু, ডাঃ বাসু। বেড়াতেই এসেছেন। তোমার তো ওই একই কারবার, পাখির পালক সংগ্রহ করে বিক্রি করা। কিন্তু জঙ্গল যে এদিকে সাফ হয়ে গেল?

হিঃ হিঃ হিঃ। কি যে বলেন স্যার, মরা পাখির পালক বেচে হু'মুঠো ভাতের ব্যবস্থা। একেবারে বিনয়ের অবতার।

দেখ, আবার কবে পালক পাও। বলেই নকুলেশ্বর আমাকে হাত ধরে জীপে এনে তুললো। এই যারা পশুপাখির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিয়ে কারবার করে, আমি হু'চোখে তাদের দেখতে পারি না। গজ-গজ করলো সে।

কৌতূহলী হলাম আমি। জীপ ছুটতেই জিজ্ঞেস করলাম, কি ব্যাপার বলতো?

আরে ওই যে মধু—মানে মধু সারেং। লোকটাকে দেখলেই আমার পিত্তি জ্বলে যায়। বাবা, কত রকম ব্যবসাই আছে, তবে

পাখির আছে, তবে পাখির পালকের ব্যবসা কেন? ওদিকে বনের মুরগীগুলি তো নিঃশেষ হয়ে গেল। লোকটা একটা আস্ত শকুন। যেই দেখা গেল মন-মুরগীর মড়ক, হঠাৎ কোথ্‌থেকে যে উদয় হয়—

একটু গলা ঝেড়ে কাশো দেখি। তখন থেকে তো পালক পালক করছো—ব্যাপার কি?

কি বলবো, ভাই। জানো তো, এই অরুণাচলের জঙ্গল যে কত রকম বন-মুরগী—আরে তোমরা বিজ্ঞানের ভাষায় যাদের ফিজাণ্ট বলো। এই ধরো ব্রাড ফিজাণ্ট। সাইজ আমাদের পোষা মুরগীরই মত। কিন্তু কি তাদের বাহার। হাঁসের মত ঠোঁট। গলা আর ল্যাজের কাছটা লাল। বিচিত্র রঙের পাখনা। কোথাও বা দেখবে ট্র্যাগোপন। মাথায় কালচে ঝুঁটি। গলার সামনেটা নীল। পিঠের ওপরটা যেন রঙ বাহার। ট্র্যাগোপনই না কত রকম। মাতির, ব্লাইথম, টেমিনজ, সক্ল্যাটারস মোনাল ফেজেণ্ট। দেখলে চোখ যেন জুড়িয়ে যায়—

ওই যে, আগেই বলেছি, নকুলেশ্বর কথা বলতে শুরু করলে থামতে চায় না।

অতএব আমাকেই থামাতে হলো তাকে, তা গোলমালটা কোথায়?

সাংঘাতিক ব্যাপার, ভাই। মাস দুই হলো সারা অরুণাচলের জঙ্গলে বণ-মুরগীর মড়ক চলেছে। কি যে হচ্ছে কিছুই আমরা বুঝতে পারছি না। কখনো সুবনসিরি, কখনো তিরাপ, কখনো বা লোহিত কথা নেই বার্তা নেই, হঠাৎ জরুরী খবর তিরাপ বা লোহিতের অমুক জায়গায় কোন না কোন বন-মুরগীর মড়ক লেগেছে। শ' শ' বন-মুরগী কোথা থেকে পঙ্গপালের মত উড়ে এসে এক জায়গায় ছটফট করে মারা যাচ্ছে। চল ছুটে। পশু চিকিৎসকদের খবর দাও। খবর পেয়ে তারা জানায়, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মরা পাখিগুলিকে পুড়িয়ে মারুন। সম্ভবত অজ্ঞাত কোন ভাইরাসের আক্রমণেই এমনটি হচ্ছে। তা পোড়াবো কি, ওই যে মধু।

যেখানেই মরা পাখি দেখতে যাই, সেখানেই মধু। এসেই তার অনুরোধ, স্যার, পুড়িয়ে আর কি করবেন। গরীব মানুষ, পাখি-গুলোর আমিই সৎকারের ব্যবস্থা করছি। পালকের ব্যবসা করি আমি। স্রেফ পালকগুলি তুলে নিয়েই, ওদের আমি পুড়িয়ে দেব।

আশ্চর্য! আমার মুখে ছোট্ট একটি মন্তব্য।

আমাদের জীপ দেখতে দেখতে সুবনসিরি নদী পেরিয়ে পাহাড়ের দিকে ছুটলো। অপূর্ব। হিমালয়ের কোন ঘেঁষে ক্রমেই আমরা উঠছি। পাহাড়ের খাঁজের মধ্যে দিয়ে এঁকে বেঁকে গভীর খাদ সৃষ্টি করে নেমে আসছে সুবন-সিরি। দুপাশে জলাবন। তারপর থাকে থাকে কত রকম যে গাছ। কোন কোন গাছ দেড় দু'শ ফুট উঁচু পর্বতের গা বেয়ে গভীর জঙ্গল আকাশ পানে উঠে গেছে। ইয়ারজালি হয়ে তা ঘণ্টা আটেকের মধ্যেই আমরা পৌঁছে গেলাম হাফোলি। এ জায়গাটা উপত্যকা। নকুলেশ্বরের বাংলো থেকে চারপাশটা দেখলে প্রাণ জুড়িয়ে যায়।

নকুলেশ্বর বললো কেমন লাগছে।

আমি বললাম, তাহলে মুঘল সম্রাট শাজাহানের কথাতেই বলি : স্বর্গ যদি কোথাও থাকে, তা এখানে--এখানে—এখানে।

নকুলেশ্বর বললো, আজকের রাত এবং কালকের দিনটা এখানে থাকো। পরশু বেরিয়ে পড়া যাবে, সুবনসিরির চারপাশ থেকেই না হয় শুরু করা যাবে, কেমন?

বললাম, যা তোমার ইচ্ছে। ইলিশ মাছের ল্যাজাই বা কি আর মুড়োই বা কি, কিছু তো আর ফ্যালনা যায় না। যেখান থেকে তুমি শুরু কর, আমার আপত্তি নেই।

হায় কপাল! সেই পরশু এলো—কিন্তু ব্রেকফাষ্টের টেবিলে যেতেই—কী ব্যাপার, নকলেশ্বর? বাড়ি থেকে কোন দুসংবাদ এলো নাকি?

তার হাতে একটি টেলিগ্রাম। মুখ যেন চুপসে গেছে।

কোন কথা না বলে হাতের টেলিগ্রাম আমার দিকে এগিয়ে দিলো নকুলেশ্বর।

ফরেস্ট রেঞ্জার গণেশ থাপার রেডিওগ্রাম : ইয়াচালির কাছে বড় সড়কের উপর আজ ভোরে শ'পাঁচেক মোনাল মুরগী মারা পড়েছে। জরুরী।

চুলোয় গেল ব্রেকফাস্ট। বেকন, মাখনরুটি, ডবল ডিমের ওমলেট, পনিরের দই মিষ্টি—সব জলাঞ্জলি। কোন রকমে নাকে মুখে গুঁজে ছুটলাম আমরা ইয়াচালি।

ঘন্টা দুয়েক।—হায় ভগবান! শ' শ' মোরগ যেন পিচঢালা পথের উপর ফুলের শয্যা।

দেখছো কাণ্ড! নকুলেশ্বরের কেঁদে ফেলার মত অবস্থা।

আমি অবাক। এ দৃশ্য দেখলে কার না চোখে জল আসে? হলোই বা তারা বন্যপ্রাণী।

মিনিট দশেক কেটেছিল এরপর—ওই যে, শয়তানটা আসছে! বললো নকুলেশ্বর। পাহাড়ের আড়ালে জীপের শব্দ কানে এলো। আর তার পরক্ষনেই সেই লোকটা—মধু সারেং।

একি কাণ্ড! স্যার, আবার এক ঝাঁক? বিস্ময়ে যেন ফেটে পড়লো সে।

তোমার তো পৌষ মাস। নাও। নিয়ে যাও এদের। পালকের ব্যবসা করো।

কি যে বলেন, স্যার। গরীব মানুষ। এই করেই তো দুমুঠো পেটের ভাত—হিঃ হিঃ হিঃ।

ভাত নয় পোলাও। গজ্ গজ্ করতে লাগলো নকুলেশ্বর।

যাই হোক বনমুরগীগুলির হিসেব নিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়েই একটি নোট নিয়ে ফেলল নকুলেশ্বর। তারপর লোকটি গণেশ থাপার হাতে দিয়ে বলল, হেড কোয়ার্টার্সে পাঠিয়ে দিও। আমি চললাম।

নোটটি নেবার সময় পরিষ্কার দেখলাম, তার ঠোঁটের কোণে দেখা দিল হাল্কা হাসি। চোখে ধূর্তোমি।

হাফোলিতে ফিরে এলাম আমরা। সে দিনের মত প্রোগ্রাম বন্ধ।

দুপুরের দিকে অফিসে গেল নকুলেশ্বর। যাওয়ার সময় বলে গেল, বিকেল তিনটের মধ্যেই ফিরছি। ইচ্ছে করলে এ সময়টা তুমি ঘুরে ফিরে কাটাতে পারো।

তা মন্দ নয়।

একটার মধ্যে খেয়ে দেয়ে বেরিয়ে পড়লাম।—আর তার পরই —গিওলিয়ানো কাডিনি না? না, না, মোটেই ভুল হয়নি। রূপোর তৈরি গোলফ্রেমের চশমা। মাথার অর্ধেকটায় চকচকে টাক। সেই লম্বা হাড়গিলে চেহারা—তা এখন তার বয়েস বছর পঞ্চান্ন তো হবেই। কিন্তু শিশু-সুলভ সেই মুখের উপর দুষ্টুমির আভাস—তাকে প্রথম দর্শনে মনে হয় ধোয়া তুলসীপাতা, অথচ আসলে আস্ত শয়তান—মোটেই আমার ভুল হয়নি। ওই হাড় কেম্পনটা এই হাফোলিতে কেন?

দেখলাম কাছের একটি রেস্তোরাঁর বসে চা পান করছে।

কি খবর, সিনর কার্ডিনি? তুমি এখানে? একেবারে সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম আমি।

বুঝতে অসুবিধে হলো না, আমাকে হঠাৎ এ ভাবে দেখে ভূত দেখার মতই চমকে উঠলো সে।

ডক্টর বাসু? কার্ডিনি আমার দিকে হাঁ করে চাইল।

চিনতে পেরেছো তাহলে?

সারপ্রাইজিং। এ ভাবে তোমার সঙ্গে আবার দেখা হবে, এ তো আমি ভাবতেই পারি না। একেবারে বিনয়ের অবতার—তোমাদের দেশ দেখতে এসেছি। ওয়াণ্ডারফুল।

কার্ডিনির সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল টেকসাস বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা করার সময়। রিওগ্র্যাণ্ড রাস্তার উপর সান্তারিতা নামে একটি বাড়িতে আমরা থাকতাম। ওর ফ্ল্যাট ছিল দোতলায়! আমার তিন তলায়। সন্ধ্যের দিকে প্রায়ই আড্ডা দিতাম ওর সঙ্গে। এমনিতে রসিক প্রকৃতির মানুষ। তবে একটা দোষ ছিল। বড় মিথ্যে কথা বলতো। আর বদস্বভাব ছিলো টাকা পয়সার

ব্যাপারে। দোকানে মালপত্র কেনার পর পাওনা মেটাতো চেকে। অনেক সময় সে চেক ব্যাঙ্ক থেকে দোকানদার মার্ফৎ ফেরৎ আসতো ব্যাঙ্কে ওর টাকা নেই বলে। তখন অনেক সময় আমাকে বাঁচাতে হয়েছে ওকে। তবে হ্যাঁ, গবেষক হিসাবে নাম করেছিল অল্প দিনের মধ্যেই। ও ছিল জীবরসায়নের গবেষক। কি একটা অদ্ভুত রাসায়নিক যৌগও নাকি তৈরি করেছিল।

কার্ডিনি আর এক কাপ চায়ের অর্ডার দিলো।

শুরু হলো আমাদের পুরনো দিনের স্মৃতিচারণ।

লক্ষ্য করলাম কথা বলতে বলতে মাঝে মাঝে কার্ডিনি কেমন যেন অন্য মনস্ক হচ্ছে।

হঠাৎ মধুর আগমন।

তাকে দেখে কার্ডিনির মুখ একেবারে কালো হয়ে উঠল।

আরে! মধুবাবু, আপনি? পাখির পালক সংগ্রহ এরই মধ্যে শেষ হয়ে গেল? প্রশ্ন করলাম আমি।

জবাব দেবে কি? মধু যেন পালাতে পারলে বাঁচে। তার সারা মুখে ফুটে উঠেছে বিহ্বলতা।

তবে চালাক লোক—হিঃ হিঃ হিঃ। এই সায়েবের জন্যে এলাম, স্যার। আমাদের দেশ দেখতে এসেছেন। ওকে একটু সাহায্য করছি।—তা সাহেবকে আপনি চেনেন নাকি?

বিলক্ষন। এক সঙ্গে ছ বছর কাটিয়েছি আমরা।

কার্ডিনির সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প হলো—তা আজ সন্দেয় আমার ডেরায় আস না, ডক্টর। এক সঙ্গে চা খাওয়া যাবে।

আমি ইতস্ততঃ করলাম।

কিন্তু যাকে বলে মতিভ্রম। বেশি চালাকি করতে গেলে যা হয়। মধুই চেপে ধরলো আমাকে।—আসুন না, স্যার। বড় আনন্দিত হবেন। আমি নিজেই আপনাকে নিয়ে আসব।

না করতে পারলাম না।

বিকেলে নকুলেশ্বরকে কথাটা বললাম।

সে বললো, যাচ্ছ যাও। তবে তাড়াতাড়ি ফিরবে। আজ রাতের দিকে ঠাণ্ডা পড়বে মনে হচ্ছে।

সন্ধে ছ'টার সময় এলো মধু। তার সঙ্গে গিয়ে উঠলাম কার্ডিনির ডেরায়। বলেছি না, হার কিপ্পন। দেখলাম শহরের এক কোণে—মানে যেখানে লোকজন বড় একটা থাকে না, সেখানে মাঠের একটি পুরনো বাড়িতে আস্তানা নিয়েছে কার্ডিনি। মনে হলো মধুও সেখানেই থাকে।

যখন সেখানে উপস্থিত হলাম, কার্ডিনি ছিল না।

মধু বললো, একটু বেরিয়েছেন সায়েব। আপনার জন্য খাবার আনতে গেছেন! এই-এসে পড়লেন বলে। আপনি একটু বসুন, আমি বরং সেই ফাঁকে চায়ের জল গরম করি। বলেই মধু রান্নাঘরের দিকে পা বাড়াল।

মধু রান্নাঘরে যেতেই—আরে, আরে? তা হলে এই হলো ব্যাপার?

দেখি কার্ডিনির ঘরের এক কোণে সেই রকমই তো একটি যন্ত্র—যা দশ বছর আগে তাকে তৈরি করতে দেখেছিলাম—! যন্ত্রটির সামনে এগোতেই—একটি শিশি। শিশির মধ্যে হলুদ রঙের তরল পদার্থ। সেই শিশিটি দেখার সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ উত্তেজিত হয়ে উঠলাম আমি—তা হলে বন-মুরগীর রহস্যের চাবি-কাঠিতো দেখছি এখানে—?

জানালা দিয়ে দেখলাম, কার্ডিনি আসছে।

নিজেকে সামলে নিয়ে দরজার কাছে একটি চেয়ার টেনে বসলাম। ভাবটা এমন যেন আমি কার্ডিনির জন্যেই অপেক্ষা করছি। ঘরের কোন কিছুতেই আমার দৃষ্টি নেই।

শুভ সন্ধ্যা। এসে গেছো তা হলে। কার্ডিনি সাদর সম্ভাষণ জানালো।

শুভ সন্ধ্যা! আমিও বিনয় প্রকাশ করলাম। আর মনে মনে বললাম, শুভ নয় হে, সন্ধ্যাটা তোমাদের পক্ষে অশুভই। আমাকে

নেমন্তন্ন না করলেই পারতে।

ঘরের মধ্যে পা দিতেই কোণের টেবিলের উপর চোখ পড়লো কার্ডিনির—গড! বলেই ছুটে গিয়ে একটি কাপড় চাপা দিলো সেই যন্ত্র এবং শিশির ওপর—মধু একটা বোকা আমার যন্ত্র নষ্ট হয়ে যাবে এভাবে খুলে রাখলে—কতকটা সাফাই গাওয়ার মত বলল সে?

কিসের যন্ত্র? আমার প্রশ্ন ভাবটা এমন, ওসব নিয়ে আমার কোন মাথা ব্যথা নেই।

না, তেমন কিছু নয়। বেড়াতে হলেও—পরীক্ষার কাজটা তো ভুলতে পারি না? এই সন্ধ্যের দিকে যখন একা থাকি—একটু গবেষণার কাজ করি।

গবেষনাই বটে। ওর কথায় কোন আমল দিলাম না।

এরপর ঘণ্টা দুয়েক কাটলো। কাডিনি এ অঞ্চলের প্রাকৃতিক দৃশ্যের প্রশংসা করলো বার-বার। আমি হুঁ হা চালিয়ে গেলাম। আর মনে মনে বলতে লাগলাম, হতচ্ছাড়া! ছোলা ভেজানোর আর জায়গা পেলে না? সবুর করো, তোমায় আমি সাবার করবো। আর সেই সঙ্গে মধুটাকেও পাঠাবো জেলে।

রাত আটটা নাগাদ নকুলেশ্বরের বাংলায় ফিরলাম। মধুই এসে পৌঁছে দিয়ে গেল।

কাল সকালে তোমাকে নিয়ে কামেং যাবো। তাড়াতাড়ি খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়ো! নকুলেশ্বর বললো।

কাল যাওয়া হবে না। আমার উত্তর।

তার মানে? নকুলেশ্বর অবাক।

নকুলেশ্বরকে ব্যাপারটা আমি খুলে বললাম।

আমার কথা শুনে রাগে থর থর করে কাঁপতে লাগলো সে। গুম হয়ে বসে রইলো কিছুক্ষণ। তারপর উত্তেজিত হয়ে বলে উঠল, দুজনকেই আমি জেলে পুরবো। ক'দিন অপেক্ষা করতে বলছো আমাকে? নকুলেশ্বরের কণ্ঠে উৎকণ্ঠা।

দু একদিনের মধ্যেই হবে। আপাততঃ দুটি কাজ তোমার। তোমার বিশ্বস্ত লোকদের মধু আর কাডিনির উপর নজর রাখতে বলো। ওরা যেন না পালাতে পারে।

বেশ। তাই হবে। নকুলেশ্বর বললো। দুদিনও গেল না।

পরদিন ভোরে খবর এলো, এখান থেকে মাইল কুড়ি দূরে নিশি (এক ধরনের উপজাতি মানুষ) পল্লীর পাশে যে উপত্যকা সেখানে আবার একঝাঁক বন-মুরগী মরে পড়ে রয়েছে।

নকুলেশ্বর এবং আমি ছুটলাম সেখানে। গিয়ে দেখি, মধুও হাজির।

তা হলে, মধু ? পালকের ব্যবসা বেশ রমরমা বলো ? খানিকটা ব্যঙ্গের সুরে কথা বললো নকুলেশ্বর।

হিঃ হিঃ হিঃ। গরীব মানুষ, স্যার, দু মুঠো ভাতের জন্যই তো এত কষ্ট করা। আর তোমাকে কষ্ট করতে হবে না।

নকুলেশ্বর ইশারা করতেই ছ'জন গার্ড এসে তাকে দুহাতে ধরে রইলো। এ কি হলো, স্যার ? মধু রীতিমত বিস্মিত।

যা অনেক আগেই হওয়া উচিত ছিল।—পালক তুমি পাবে না, মধু। আর এখানে আমাদের সঙ্গে তুমি অপেক্ষা করবে আধঘণ্টার মত সময়।

এবার হতশায় কেঁদে ফেললো মধু।—বললো, আমার কোন দোষ নেই, স্যার। যত নষ্টের গোড়া ওই সায়েব।

হচ্ছে, হচ্ছে। তোমার সায়েবও এসে পড়লো বলে।

নকুলেশ্বরের কথা শেষ হতেই একটি সঙ্গে কার্ডিনি।

আমাকে দেখেই কার্ডিনি তো একেবারে গুম।

ঠাঁয় বসে রইলাম আমরা প্রায় আট ঘণ্টা। আমাদের সামনে পথের দুধারে পড়ে শ' কয়েক বন-মুরগী।

অবশেষে—সে এক দৃশ্য বটে। ঘণ্টা আটেক শেষ হতেই—যাকে বলে ম্যাজিক। বন-মুরগীগুলি জ্যান্ত হয়ে চোখের পলকে বনের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আনন্দে চিৎকার করে উঠলো নকুলেশ্বর। তারপর মধু এবং কাডিনির দিকে চেয়ে বললো—আপনাদের আমি অ্যারেস্ট

করলাম। বেআইনীভাবে বন্য প্রাচীর চোরা-কারবারের জন্যে। তারপর ইশারা করতেই রক্ষীরা তাদের নিয়ে চলে গেল।

ওরা চলে গেলে নকুলেশ্বর আমার কাঁধ চাপড়ে বললো, কৃতিত্ব সবটাই তোমার। তা ওদের কায়দাটা আর একবার বলতো শুনি ?

পরিস্কার ব্যাপার। আমি বললাম। কার্ডিনির ওই শিশির মধ্যে যে বস্তুটি ছিল তাকে বলা হয় ফেরোমোন। এক ধরনের প্রোটিন রাসায়নিক যৌগ। রাতে জঙ্গলে এসে এক ফাঁকে কয়েক ফোঁটা ফেরোমোন বাতাসে ছড়িয়ে দিত কার্ডিনি। এটা বিশেষ ফেরোমোন। কাডিনিরই আবিস্কার। তার গন্ধে মুরগীর দল ছুটে আসতো। তখন ওই যে যন্ত্রটা—তার সাহায্যে সৃষ্টি করতো হাইপার সাউণ্ড। সে শব্দ কানে শোনা যায় না। কিন্তু তার প্রভাবে মুরগী-গুলির মগজ কয়েক ঘণ্টার মত অকেজো হতো। অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকতো ওরা। মধু যে বলতো পালক সংগ্রহ করতো সে—বাজে কথা। আসলে ধাপ্পা মেরে তোমাদের সরিয়ে দিত সে। তারপর মুরগীদের জালে পুরতো। কয়েকঘণ্টা গেলেই ওরা হতো জ্যান্ত। তখন জেরো বা নেপালের বর্ডার দিয়ে বিদেশে চড়া দামে পাচার করতো। মতলবটা কার্ডিনির। ব্যবসাটা ওরা ফেঁদেছিল বেশ।

একেবারে মোক্ষম ফাঁদ বলো। মন্তব্য করলো নকুলেশ্বর।

যা বলেছ। এবার মামংএ চলো, কামেং ঘুরে আসি। এখন তো তুমি নিশ্চিন্ত।

নিশ্চিন্ত বলে—। আনন্দে আবার আমার কাঁধে চাপড় মারলো নকুলেশ্বর।



লাল জঙ্গল

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়



চান করবার জন্যে বাথরুমে ঢুকলেই দিপুর প্রায় এক ঘণ্টা লেগে যায়। মা, বাবা, দিদি ব্যস্ত হয়ে ওঠে। এই সময়ে সকলেরই ইস্কুলকেলেজ-অফিসে যাওয়ার তাড়া। এখন কি বেশিক্ষণ বাথরুমে আটকে রাখলে চলে? দিদি আর মা ঘুরে ফিরে বাথরুমের দরজায় ধাক্কা দিয়ে বলেন, এই দিপু, তোর হলো? এতক্ষণ কী করছিস? এইবার বেরো!

দিপু কোনো উত্তর দেয় না।

বাথরুমে ঢুকলেই দিপু নানারকম স্বপ্ন দেখতে শুরু করে। স্বপ্ন তো যে-কোনো জায়গাতেই দেখা যায়। তবু, বাথরুমের ছোট্ট ঘরটায় দরজা-জানলা বন্ধ করে জেগে জেগে স্বপ্ন দেখার যেন বেশি সুবিধে হয়। মাথার ওপরের শাওয়ারটা খুলে দিয়ে সে সামনের সাদা দেয়ালের দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। তখন দেয়ালটা হয়ে যায় ছায়াছবির পর্দা। দিপু তার ওপরে মনে মনে সিনেমা বানায়।

কল্পনায় দিপু সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে আকাশে উড়ে বেড়াতে। প্লেনে, হেলিকপটারে বা প্যারাসুটে নয়। এমন কি পক্ষিরাজ ঘোড়ায় চেপেও নয়। দিপু নিজেই একট যান তৈরি করে

ফেলেছে মনে মনে। কাগজে সেই উড়ন্ত যান তৈরি করে ফেলেছে মনে মনে। কাগজে সেই উড়ন্ত যানটার ছবিও সে এঁকেছে অনেকবার। বড় মামাদের বাড়িতে দিপু একটা পোরসিলিনের বাথ টাব দেখেছিল। পুরোনো আমলের জিনিস, বাইরেটা বেশ কারুকার্য করা। দিপুর উড়ন্ত যানের তলাটা ঠিক ঐ বাথটাবের মতন, আর ওপরটা কাচ দিয়ে ঢাকা। সেই কাচের দেয়াল প্রায় দু'মানুষ লম্বা, ভেতরে সিঁড়ি আর দুটি জানলা আছে।

দিপু যখনই ইচ্ছে করে, তখনই এই উড়ন্ত যানটা তার কাছে এসে উপস্থিত হয়। তারপর সে ঘুরতে বেরোয়। কোনোদিন এভারেস্টের চূড়ায়, কোনাদিন সমুদ্রের বুকে কোনো দ্বীপে।

মনে মনে উড়ে বেড়াতে বেড়াতে দিপু বুঝতে পারে যে ভূগোল বইতে বা ম্যাপে কোনো উল্লেখ নেই এমন অনেক জায়গাই এখনো পৃথিবীতে আছে। যেমন, এই তো গতকালই দিপু নেপালের ওপর দিয়ে উড়তে উড়তে ধওলাগিরি শৃঙ্গ পেরিয়ে একটা উপত্যকা দেখতে পেল, যেখানে সবকটা গাছের রং লাল। এর আগে কেউ তো পুরোপুরি লাল রঙের একটা জঙ্গলের কথা বলেনি।

দিপু অনেকক্ষণ ছিল সেই উপত্যকায়।

সেই জঙ্গলে দিপু অতিকায় পাখির মতন এক ধরনের রহস্যময় প্রাণীও দেখতে পাচ্ছিল, কিন্তু বেশিক্ষণ দেখা হলো না। তার আগেই দিদি ধাক্কা মেরে দিল বাথরুমের দরজায়।

কল্পনার জগতে যে কোনো ম্যাপ থাকে না, সেইটাই যা মস্কিল। তারপরের দিন দিপু আর সেই লাল জঙ্গলটা খুঁজে পায় না। তার রকেট চালিয়ে সে নেপালের পাহাড়ী উপত্যকায় অনেক ঘোরাঘুরি করলো কিন্তু সেই লাল জঙ্গলের কোনো চিহ্নই নেই। সেটা কোথায় হারিয়ে গেছে!

শুধু বাথরুমে কেন, স্কুলের ক্লাসে বসে, কিংবা ঘুড়ি ওড়াবার জন্য ছাদে গিয়েও দিপু এমন অনেক কিছু দেখতে পায় যা অন্য কেউ দেখে না। যেমন সে একদিন দেখেছিল, তাদের ভূগোলের টিচারের দুটি ডানা আছে।

ভূগোলের টিচার জ্যোতিপ্রকাশ বাবু পড়ান বেশ ভালো, কিন্তু মানুষটি কেমন যেন অদ্ভুত। তিনি ক্লাসে পড়ানো ছাড়া আর একটাও অন্য কথা বলেন না। কখনো হাসেন না। প্রায়ই জানলা দিয়ে তাকিয়ে থাকেন বাইরের দিকে। যেন তাঁর মন পড়ে আছে অন্য কোথাও।

দিপু একদিন দেখলো, ছুটির পর জ্যোতিপ্রকাশবাবু স্কুলের পেছনের দিকে দোতলার বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালেন। আস্তে আস্তে তাঁর দু'হাতের পাশ দিয়ে দুটি ডানা ফুটে বেরুলো। বেশ বড় ডানা। বিষ্ণুর বাহন গরুড়ের মতন। গরুড়ের যেমন ডানা আছে, হাতও আছে, সেই রকম।

ভূগোলের টিচারের সেরকম ডানা দেখে সে আশ্চর্য হয়নি। এরকম তো হতেই পারে!

কিন্তু জ্যোতিপ্রকাশবাবু সেই থানা মেলে ওড়বার উদ্যোগ করে একবার পেছন ফিরে তাকালেন। অমনি দিপুর সঙ্গে তাঁর চোখা-চোখি হয়ে গেল।

তিনি সঙ্গে সঙ্গে গলা খাঁকারি দিয়ে ডানা গুটিয়ে ফেললেন, তারপর সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলেন নিচে।

দিপু ঠিক করেছিল, ভূগোলের স্যারের সঙ্গে এই ডানা বিষয়ে একদিন আলোচনা করবে। তিনি যদি শিখিয়ে দেন যে কী করে ডানা গজাতে হয়, তা হলে বেশ হয়।

কিন্তু দিপু সে সুযোগ আর পেল না। কয়েকদিন পর থেকেই জ্যোতিপ্রকাশবাবু স্কুলে আসা একেবারে বন্ধ করে দিলেন। তার-পর জানা গেল, তিনি নিরুদ্দেশ হয়ে গেছেন। তাঁর বাড়ির লোকও কেউ বলতে পারে না যে তিনি কোথায় চলে গেছেন বা কোথায় যেতে পারেন। পুলিশে খবর দিয়েও কোনো লাভ হলো।

একমাত্র দিপু জানে ভূগোলের টিচারের কী হয়েছে। জ্যোতি-প্রকাশবাবু মাঝে মাঝেই গোপনে ডানা মেলে অনেক দূরে দূরে বেড়াতে যেতেন। একদিন ঐরকম কোথাও গিয়ে ফেরার রাস্তা

হারিয়ে ফেলেছেন। কিংবা এবারে যেখানে গেছেন সেই জায়গাটাই এত পছন্দ হয়ে গেছে যে আর ফিরে আসতে মন চাইছে না।

এই কথা বললে অবশ্য কেউ বিশ্বাস করবে না। দিপুকে ভাববে পাগল কিংবা গুলবাজ। কিন্তু দিপু যে একদিন নিজের চোখে টিচারের ডানা বেরুতে দেখেছে।

আর একদিন দিপু ছাদে বসে আছে একা। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে। দুটো শালিক কার্নিসে বসে কিচির মিচির করছে। বিকেল শেষ হয়ে আসছে, আকাশের মেঘ রং বদলাচ্ছে। দিপু প্রায়ই এই সময়টায় আকাশের দিকে চেয়ে থাকে। তার ধারণা, হঠাৎ মেঘের আড়ালে কোনো একদিন একটা কিছু দেখা যাবে।

সেরকম কিছু দেখতে পেল না অবশ্য, কিন্তু এক সময় সে শুনতে পেল, একটা শালিক আর একটা শালিককে বলছে, আর বলিস না। আর বলিস না, ঐ ছেলেটা সব বুঝতে পেরে যাবে।

দিপু চমকে তাকালো। শালিকরা ঐ কথা বলছে কেন? সে কী বুঝতে পারবে? শালিকদের বুঝি গোপন কথা থাকে?

তারপর সে আরও চমকে গেল এই জন্য যে শালিকটা মানুষের ভাষায় কথা বলে উঠলো কী করে?

সে উঠে দাঁড়াতেই শালিক দুটি তার দিকে তাকিয়ে ঠিক যেন মুচকি হেসে পিড়িং করে উড়ে গেল।

দিপু খানিকক্ষণ হাঁ করে চেয়ে রইলো। শালিকরা মানুষের ভাষা শিখে নিতে পারে? মানুষের কাছাকাছিই তো ওরা থাকে। রোজ মানুষের কথা শোনে। কিন্তু কোন্ জিনিসটা ওরা দিপুর কাছ থেকে গোপন করতে চাইছিল।

এই ঘটনাটাও দিপু কারুকে জানাতে পারেনি। যে কেউ শুনলেই বলবে, দিপু ভুল শুনেছে!

এই সব রহস্যময় ব্যাপারের চেয়েও বাথরুমের দেয়ালটাকে সিনেমার পর্দার মতন করে নিয়ে দিপু যখন কল্পনার জগতে উড়ে যায়, তখন সে অনেক বেশি আনন্দ পায়।

তার বাথটাবের মতন আকাশ যানটিকে সে এক একদিন নতুনভাবে সাজায়। কাচের গোল ঘরটাতে আগে সিঁড়ি ছাড়া আর কিছু ছিল না। একদিন সে সিঁড়িটার গায়ে লতানে গাছ জড়িয়ে দিল। লাল গাছ নয় অবশ্য, সবুজ।

চার্লি চ্যাপলিনের একটা পোস্টার ছবি দিপুর খুব প্রিয়। একদিন সেই ছবিটাকে ও রকেটে নিয়ে নিল।

দিপুর একটা মুস্কিল হয়ে গেল পূজোর ছুটিতে।

বাবা সবাইকে নিয়ে বেড়াতে গেলেন মধ্যপ্রদেশে। মা, বাবা, দিদি আর সে। ছোটমামা দণ্ডকারণ্যে চাকরি নিয়েছেন, তিনিই নেমন্তন্ন করেছেন।

দিপুর অবশ্য ট্রেনে বেড়াতেও খুব ভালো লাগে। সবচেয়ে ভালো লাগে রাত্তির বেলা। অন্ধকারের মধ্য দিয়ে ছুটে যায় ট্রেন। সামনে কী আছে কেউ জানে না। রাত্তির বেলা চলন্ত ট্রেনে ঘুম আসে না, দিপু জানলা দিয়ে তাকিয়ে থাকে বাইরে।

রায়পুরে নেমে নেওয়া হলো একটা জিপ। তারপর অনেক দূরের পথ। যেতে যেতে জঙ্গল, পাহাড় কত কী পার হয়ে যেতে হলো।

প্রায় গোটা একবেলা পার করে ওরা পৌঁছোলো জগদলপুরে। সেখানে ছোটমামা অপেক্ষা করছিলেন।

এককালে বাস্তার নামে একটি স্বাধীন রাজ্য ছিল। এই জগদলপুর ছিল তার রাজধানী। এখন তো আর রাজাদের রাজত্ব নেই, তার বাস্তার এখন মধ্যপ্রদেশের একটি জেলা। জগদলপুরকে দেখেও আগেকার রাজধানীর কিছুই চেনা যায় না, শুধু পুরোনো পুরোনো দু'একটা বাড়ি চোখে পড়ে।

শহরটা দেখে বাবার পছন্দ হলো না। তিনি ছোট মামাকে বললেন, এ কোথায় নিয়ে এলে? এই যে শুনেছিলুম তুমি মধ্যপ্রদেশের জঙ্গলে থাকো?

ছোটমামা হেসে বললেন, জঙ্গলে থাকলে ইলেকট্রিক ইঞ্জিনীয়ারে চাকরি করা যায় ? ঠিক আছে, চিন্তা করবেন না। জামাইবাবু, আপনাদের জন্য আমি জঙ্গলে থাকারই ব্যবস্থা করে রেখেছি।

জগদলপুরে দু'দিন থেকে ওরা চলে এলো সেখান থেকে বাইশ দূরে গভীর জংগলের মধ্যে এক বাংলোতে। বাংলোটি বেশ সুন্দর। সামনে বাগান, পেছন দিকে পাহাড়।

জায়গাটা সকলেরই বেশ পছন্দ হলো, অসুবিধে হলো শুধু দিপুর।

এই বাংলোর সবই ভালো, শুধু বাথরুমটা অন্ধকার!

আগেকার দিনের তৈরি বাড়ি, বাথরুমটাও শোওয়ার ঘরের মতন বড়। কিন্তু তাতে জানলা নেই। ওপরের দিকে আছে স্কাই-লাইটের কাচ। কিন্তু ক'দিন ধরেই আকাশ মেঘলা বলে আলো আসে না। এ বাংলোতে ইলেকট্রিসিটিও নেই যে লাইট জ্বালা যাবে।

স্নান করতে গিয়ে দিপু বাথরুমের দেয়ালের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। কিন্তু দেয়ালটা ভাল দেখা যায় না বলে সেটা সিনেমার পর্দা হয়ে ওঠে না।

স্নানের আগে কিছুক্ষণ বাথটাবের মতন আকাশযানে কিছুক্ষণ শূন্যে উড়ে আসা দিপুর অভ্যাস। এখন আর সেটি হচ্ছে না। দিপু কিছুতেই তার আকাশযানকে দেখতে পাচ্ছে না। এমনকি চোখ বুঁজলেও সে দেখতে পায় না।

এর জন্য দিপুর যে কী কষ্ট তা অন্য কেউ বুঝবে না!

একদিন গেল, দু'দিন গেল, তৃতীয় দিন তো সারাদিনই টিপির টিপির বৃষ্টি। দিপুর মেজাজ খুব খারাপ হয়ে গেছে। অন্য কারুর সংগে তার কথা বলতেই ইচ্ছে করছে না।

বৃষ্টির দিনে দিদি স্নান করে না। বাবাও বাদ দিয়ে দেন। সুতরাং বাথরুম বেশিক্ষণ আটকে রাখলে কোনো অসুবিধে নেই। কিন্তু স্নান করতে এসে দিপুর কান্না পেয়ে গেল।

বাথরুমের দরজাটা বন্ধ করলে এমন অন্ধকার হয়ে গেল যে দিপু প্রায় নিজেকেই দেখতে পায় না। দেয়াল দেখবে কী? আজও সে উড়তে পারবে না! আকাশযানটা কি কলকাতা ছেড়ে বাইরে এসে আর দিপুর দখলে থাকবে না?

দিপু সেই অন্ধকারের আবছা দেয়ালের সামনেই দাঁড়িয়ে রইলো। তারপর খুব মন দিয়ে আকাশ যানটার কথা ধ্যান করতে লাগলো। ওকে আসতেই হবে এখানে।

কিন্তু কিছুতেই আসছে না। দিপু দেয়ালে কোনো ছবি দেখতে পাচ্ছে না।

বাথরুমের দরজাটা খুলে দিল, তাতে একটু আলো হলো। দিপু আবার তীব্র মনোযোগ দিয়ে তার বাথটাব আকাশযানটার কথা চিন্তা করতে লাগলো বেশ খানিকক্ষণ ধরে। তাতেও সে ব্যর্থ হলো। নোনাধরা দেয়ালটাতে শুধু ফাটা ফাটা দাগ তাতে কোনো ছবিই ফোটে না।

সেদিন দুপুর তিনটের সময় খেয়ে দেয়ে সবাই যখন একটু শুয়েছে, দিপু একা বেরিয়ে পড়লো বাংলো থেকে। বৃষ্টি এখনো পড়ছে, তবু দিপুর ভ্রূক্ষেপ নেই। কেউ যেন তাকে ডাকছে, যেতেই হবে।

বাংলোটার সামনের রাস্তা পেরুলেই জংগল। প্রথমে পাতলা পাতলা, তারপর গভীর।

দিপু ঢুকে পড়লো সেই জঙ্গলের মধ্যে। দূরে দড়্ দড়্ করে জলের শব্দ হচ্ছে। ওখানে একটা ছোট ঝর্ণা আছে। সেখানেই যেন যেতে হবে দিপুর।

ঝর্ণার কাছেই জঙ্গলটা একটু ফাঁকা। দিপু দূর থেকে দেখলো, ঝর্ণার পাশে তারই বয়েসী একটি ছেলে দাঁড়িয়ে আছে।

দিপুর সঙ্গে চোখাচোখি হতেই ছেলেটি হাতছানি দিয়ে তাকে ডাকলো।

আরো কাছে গিয়ে দিপু দারুণ অবাক হয়ে বলে উঠলো, এ কি!

ছেলেটি শুধু যে দিপুর সমবয়েসী তাই-ই নয়, তাকে অবিকল দিপুর মতনই দেখতে। মাথার চুল থেকে পায়ের আঙুল পর্যন্ত পুরোপুরি মিল।

ছেলেটি একটু হেসে বললো, কেমন আছো দিপু?

দিপু বললো, তুমি···তুমি···মানে···তুমি কে? আমি কি স্বপ্ন দেখছি?

ছেলেটি বললো, মোটেই স্বপ্ন দেখছো না। গায়ে চিমটি কেটে ছাখো। আমি তোমার প্রতিভাস!

দিপু বললো, তার মানে?

ছেলেটি বললো, তুমি প্রতিভাস গ্রহের নাম শোনো নি? তোমরা পৃথিবীর মানুষরা বড্ড পিছিয়ে আছো?

দিপু তবু কিছু বুঝতে পারছে না। সে অনেক অদ্ভুত, অলৌকিক দৃশ্য দেখে, কিন্তু এটা সে মেনে নিতে পারছে না কিছুতেই। ছেলেটি কি অন্য গ্রহ থেকে এসেছে? তা আসতে পারে। তাতে এত আশ্চর্য হবার কিছু নেই। মানুষ চাঁদে পৌঁছে গেছে, কিছুদিন পরে অন্য গ্রহতেও যাবে। অন্যান্য গ্রহের মানুষ বা অন্য কোনো প্রাণী থাকলে তারাও পৃথিবীতে আসতে পারে। কিন্তু এর চেহারা দিপুর মতন হবে কী করে? এমনকি পোষাক পর্যন্ত এক রকম।

ছেলেটি যেন দিপুর মনের কথা পড়তে পারলো।

সে হেসে বললো, শুধু চেহারা আর পোষাকই এক নয়, আমার নামও দিপু।

দিপু বললো, তা হলে এটা নির্ঘাৎ স্বপ্ন।

ছেলেটি বললে, মোটেই স্বপ্ন নয় তোমাদের পৃথিবীতে যা যা আছে। আমাদের অবশ্য দু'চারটে জিনিস আছে, সেগুলো তোমরা মাঝে মাঝে কল্পনা করে পুষিয়ে নিচ্ছো। যেমন···

ছেলেটি হঠাৎ থেমে গিয়ে মুচকি মুচকি হাসতে লাগলো।

দিপুর প্রথমে একটু ভয় ভয় লাগছিল, এবারে সে এগিয়ে গিয়ে ছেলেটির গায়ে হাত রাখলো। হ্যাঁ, রক্ত মাংসেরই মানুষ। স্বপ্ন নয়, ছায়া নয়।

দিপু বললো, ব্যাপারটা কী হচ্ছে, একটু বুঝিয়ে দাও তো।

অন্য দিপু বললো, অত বুঝে কী হবে? ধরে নাও না, ঠিক তোমার মতন আর একজন কেউ অন্য কোথাও আছে। তোমার বাবার মতন, তোমার মা, দিদি, ছোটমামা সকলের মতনই এক একজন আমাদের ওখানে আছে।

—সত্যি?

—আমি তো মিথ্যে কথা বলতে এখানে আসিনি। বরং তোমাকে একটু সাহায্য করতে এসেছি।

—কী সাহায্য?

—আমার একটা শূন্যযান আছে, সেটা ঠিক বাথটাবের মতন দেখতে। ওপরে কাচের গোল ঘর ভেতরে সিঁড়ি।

—অ্যাঁ! কী বলছো তুমি?

—আমার ঐ শূন্যযানটিকে তুমি প্রায়ই কল্পনা করতে। আজ তুমি এমন তীব্রভাবে কল্পনা করছিলে যে আমার যানটা কেঁপে কেঁপে উঠছিল। জানো তো খুব মন দিয়ে কোনো কিছু চাইলে তা ঠিকই পাওয়া যায়। তোমার জন্য ওটা আমি নিয়ে এসেছি!

—ওটা মানে?

—আমার বাথটাব আকাশযান। দেখবে এসো! দিপুর হাত ধরে অন্য দিপু নিয়ে গেল জঙ্গলের মধ্যে।

একটা ফাঁকা জায়গায় পড়ে আছে পোর্সিলিনের বিরাট একটা বাথটাব, তার ওপরে কাচের গোলঘর। ভেতরে কাঠের সিঁড়ি, তাতে লতানো গাছ জড়ানো। কাচের দেয়ালে সাঁটা একটা চার্লি চ্যাপলিনের পোস্টার।

অন্য দিপু তার দরজা খুলে দিপুকে বললো, চলো, একটু ঘুরে আসা যাক।

দিপু বললো, এখনো বলছো আমি স্বপ্ন দেখছি না? তোমার আকাশযানে আমার ঘরের চার্লি চ্যাপলিনের ছবি কী করে এলো?

অন্য দিপু বললো, এটা এমন আর কী শক্ত কাজ! তুমি যে

যে জিনিস খুব বেশি চাও কল্পনায়, সেটা আমি তৈরি করে নিই। তোমাকেও সেরকম করতে হয়। যেমন, আমি যখন খুব কল্পনা করি যে কোনো পাখি মানুষের ভাষায় কথা বলছে, তখন তুমি সেটা সত্যি সত্যি শুনতে পাও।

—আমি এখনো বিশ্বাস করতে পারছি না।

—বিশ্বাসের দরকার নেই। কোথায় ঘুরে আসতে চাও বলো।

—তুমি আমাকে লাল জঙ্গল দেখাতে পারো?

অন্য দিপু চমকে উঠে বললো, আবার লাল জঙ্গল? একবার দেখেছিলে তাতে শখ মেটেনি।

—মোটে একটুখানি দেখেছিলুম।

—ঐ যথেষ্ট। না, লাল জঙ্গল থাক, চলো, অন্য কোথাও যাই। উত্তর মেরুতে যাবে?

—যেখানে তো খুব শীত! কেন, লাল জঙ্গলে যেতে চাইছো না কেন?

—সে বড় সাঙ্ঘাতিক জায়গা! সেখানে গেলে আর ফিরতে ইচ্ছে করে না। তুমি তো যাওনি, আমি গিয়েছিলুম একদিন, তুমি শুধু কল্পনায় দেখেছো। আমি অতি কষ্টে ফিরিয়ে এনেছি নিজেকে।

—সেখানে ভয়ের কী আছে। খুব বড় বড় পাখি দেখেছিলুম।

—ওগুলো পাখি নয়। লাল জঙ্গলে ভয়ের কিছু নেই। বিপদ নেই। কিন্তু কিছু একটা জাদু আছে। চুম্বকের মতন টেনে রাখে।

—যদি যেতে হয় তো আমি ওখানেই যাবো!

—তুমি দেখছি ঠিক আমারই মতন জেদী। চলো তা হলে…। কিন্তু খুব সাবধান। যখন ফিরতে বলবো, তখনই ফিরবে।

দু'জনে ভেতরে ঢুকতেই আকাশযানটা আকাশে উঠে গেল। কোনো ইঞ্জিন নেই, মেশিন ঘর নেই, ওটা ইচ্ছা শক্তিতে চলে।

জঙ্গল, পাহাড়, নদী পেরিয়ে সেটা মুহূর্তে বহু দূর চলে গেল। বহু উঁচুতে উঠে তারপর আস্তে আস্তে নামতে লাগলো নিচের দিকে।

অন্য দিপু বললো, ব্যাস, আর নয়। এবারে চেয়ে ছাখো।

দিপু দেখলো নিচের পাহাড়ী উপত্যকা থেকে একটা লাল আভা আসছে শুধু। গাছগুলোকে ভালো দেখা যাচ্ছে না।

দিপু বললো, আর একটু নিচে নামো।

—যাক, আর দরকার নেই।

—গাছগুলোকে যে দেখতেই পাচ্ছি না।

—বেশি নিচে নামবো না কিন্তু।

আর একটু নিচে নামার পর দেখা গেল বড় বড় গাছ। টক টকে আগুনের মতন লাল তাদের পাতার রং। মাঝখান দিয়ে একটি নদী বইছে, তার জলের রং সোনালী। সেই নদীর ওপরে উড়ছে কয়েকটা খুব বড় বড় পাখি?

দিপু জিজ্ঞেস করলো, ওগুলো কী পাখি?

—ওটা পাখি নয়। মানুষ।

—অ্যাঁ! কী বলছো?

—ঠিকই বলছি। চলো, ফিরে যাই।

—না আর একটু নিচে নামবো।

হু'জনের হু'রকম কথায় আকাশযানটা মজার ব্যবহার করতে লাগলো। যেই একজন বলে ফিরে যাই, অমনি সেটা ওপরে উঠতে শুরু করে। আর যেই অন্য জন বলে, নিচে নামবো, অমনি আকাশযানটা আপনি আপনি নেমে যায় আবার।

একবার অনেকখানি নিচে নেমে এসে দিপু সেই মানুষ পাখি-গুলোর মুখ দেখতে পেল। তার মধ্যে একটি মুখ তার খুব চেনা। তাদের সেই ভূগোল টিচার জ্যোতিপ্রকাশ বাবু।

দিপু চেঁচিয়ে ওঠলো, স্যার।

অন্য দিপু বললো, ডেকো না। ওদের সঙ্গে কথা বলতে নেই!

দিপু বললো, আমি নিচে নামবো। ওঁদের সঙ্গে কথা বলবো।

—না!

—হ্যাঁ, আমি যাবোই। আমি ফিরতে চাই না।

—তোমাকে লাল জঙ্গলের জাদুতে টেনেছে। ফিরে চলো।

—চুপ করো! তোমার কথা শুনতে চাই না!

আকাশযানটা ওদের কথা অনুযায়ী একবার উঠছে, একবার নামছে।

একবার খুব নিচে নেমে আসায় দিপু আনন্দে চেঁচিয়ে উঠলো, আমি জিতে গেছি। এবারে আমরা লাল জঙ্গলের মাটিতে নামবো!

—তাহলে তোমার কল্পনা শক্তি নষ্ট হয়ে যাবে, তাই চাও?

—অ্যাঁ? কী বললে?

—এখানে কারুর স্মৃতি থাকে না। ঐ পাখি মানুষগুলো ফেরার রাস্তা ভুলে গেছে সেইজন্য। এখানে কেউ কিছু কল্পনা করে না। এখানে বাথরুমের দেয়াল নেই।

দিপু বলে উঠলো, তা হলে নিচে যাবো না। আর না। আমরা ফিরবো।

অন্য দিপুও চেঁচিয়ে উঠলো, ফিরবো, ফিরবো!

আকাশযানটা আবার শোঁ শোঁ করে ওপরে উঠে গেল।



ঘটোৎকচের জাগরণ



সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

সেহরাগড় ফরেষ্টবাংলোয় ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। নাম ডক্টর আর পি গুণ্টা। তিনি এক বিস্ময়কর মানুষ!

প্রথমে চোখে পড়েছিল ওঁর অস্বাভাবিক দৈর্ঘ! অত লম্বা মানুষ গিনেস রেকর্ড বইতে এখনও উল্লিখিত হননি বলে আমার বৃদ্ধ বন্ধু আক্ষেপ করেছিলেন। তাই শুনে ডাঃ গুণ্টা হাসতে হাসতে বললেন, 'কী দরকার? আসলে কী জানেন, নিজের এই লম্বা হওয়া নিয়ে আমার নিজেরই ভীষণ অস্বস্তি হচ্ছে। রাস্তাঘাটে বেরুলে সাড়া পড়ে যায়। সেখানে যাই, পেছনে ভিড়। তার ওপর সমস্যা হল, দরজার মাপ। কোনো বাড়িতে ঢুকতে হলে প্রতিমুহূর্তে আমাকে নিজের উচ্চতা সচেতন থাকতে হচ্ছে। আবার অনেক সময় মনেও থাকেনা কথাটা এবং মাথায় ঠোক্কর খাই। এই দেখুন না, কী অবস্থা হয়েছে।'

কপালে অনেক কালো ছোপ দেখে সমস্যাটা হাড়ে টের পেলাম। বললাম, 'আপনার এই দৈর্ঘের সঙ্গে প্রস্থটাও যদি বাড়ত তাহলে লোকেরা আমাকে ভয়ও পেত।'

ডঃ গুণ্টা বললেন, রক্ষে করুণ মশাই। তাহলে লোকেরা আপনাকে ঘটোৎকচ বলতে শুরু করত। কী বলেন কর্নেল?

কর্নেল চোখ বুজে শাদা দাড়ি টানাটানি করছিলেন,। 'আচ্ছা ডঃ গুপ্তা, কবে থেকে আপনি লম্বা হতে শুরু করেছেন?'

ডঃ গুপ্তা কর্নেলের কথায় অবাক হলেন যেন। 'তা তো লক্ষ্য করিনি। তবে যতদূর মনে পড়ছে, মাস তিনকে আগে একদিন ভোরবেলা বাথরুমে ঢুকতে গিয়ে চৌকাঠে ঠোক্কর লাগল মাথায়। তখন···মাই গুডনেস!'

উনি আরামকেদারা থেকে সোজা হলেন হঠাৎ। কর্নেল বললেন, 'কী ব্যাপার?

'আমার মতো বোকা দেখছি পৃথিবীতে নেই।' ডঃ গুপ্তা মুখে হতাশার ভাব ফুটিয়ে বললেন। 'কী আশ্চর্য্য! সত্যি তো ব্যাপারটা ভেবে দেখা উচিত ছিল আমার। ওই প্রথম মাথায় ঠোক্কর খাবার আগের দিন সম্ভবত আমার উচ্চতা প্রায় স্বাভাবিক ছিল।······হ্যাঁ, স্বাভাবিক ছিল। কারণ তার আগে তো বাথরুমে কেন, কোনো দরজার সামনে আমাকে মাথা হেঁট করতে হয়নি। কর্নেল, এই ব্যাপারটা আমার লক্ষ্য করতে ভুল হয়ে গেছে দেখছি।'

কর্নেল ওঁকে যেন আশ্বস্ত করতে চেয়েই বললেন, 'পৃথিবীর অধিকাংশ বিজ্ঞ মানুষই নিজের সম্পর্কে অসচেতন। ও নিয়ে দুঃখ করার কিছু নেই। পিটুইটারি গ্ল্যাণ্ডের একটু হেরফের ঘটলে মানুষ বামন কিংবা দৈত্য হয়ে ওঠে। শুধু তাই নয়, তাদের গায়ে প্রচণ্ড শক্তিও এসে যায়।'

ডঃ গুপ্তা আস্তে বললেন, 'তা ঠিক। কিন্তু আমার বয়স প্রায় পঞ্চান্ন হয়ে এল। এই বয়সে হঠাৎ আমার পিটুইটারি গ্ল্যাণ্ড কেন এ খেল দেখাল বোঝা যাচ্ছে না। অবশ্য আমি অনেকের তুলনায় একটু লম্বা ছিলাম ছেলে বেলা থেকেই। হঠাৎ একটা যেন দুর্ঘটনা ঘটল। আমি রাতারাতি শত ফুট উঁচু হলাম। অথচ খেয়াল পর্যন্ত করলাম না। কর্নেল, ব্যাপারটা ভারি গোলমেলে মনে হচ্ছে। আমি যাই।'

উনি হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন। তারপর দরজা দিয়ে মাথা যতদূর

সম্ভব নিচু করে বেরিয়ে গেলেন। কর্নেল তাকিয়ে রইলেন অবাক চোখে। আমিও।

ডঃ গুপ্তা উঠেছিলেন পাশের ঘরে। কিছুক্ষণ পরে বেরিয়ে সে ঘরের দরজায় তালাবন্ধ দেখলাম। বললাম, । 'কর্নেল, ডঃ গুপ্তা কি বাংলো ছেড়ে চলে গেলেন নাকি !

কর্নেল আমার কথার জবাব দিলেন না। 'চলো জয়ন্ত, সেহরাগড় কোর্টের ধ্বসাবশেষ দেখে আসি।'

এই বাংলোটা একেবারে সংরক্ষিত জঙ্গলের ভেতর একটা টিলার গায়ে! নিচে ছোট এক নদী। কাঠের সাঁকো পেরিয়ে বন জঙ্গল শুরু। দুর্গে পৌছুতে ঘণ্টাখানেক লাগল।

কিন্তু যা ভেবেছিলাম, তাই ঘটল। প্রকৃতিবিদ দুর্গের ওপর থেকে বাইনোকুলারে কী পাখি দেখতে পেয়ে আমার অস্তিত্ব ভুলে গেলেন এবং ধ্বংসাবশেষের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেলেন। দেয়ালের ওপর বসে আমি নিচের জঙ্গলের শোভা দেখতে থাকলাম।

কতক্ষণ পরে পেছনে কী একটা শব্দে চমকে উঠে দেখি, ডঃ গুপ্তা একটা প্রকাণ্ড পাথর ধরে টানাটানি করছেন। আমি ভীষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম।

ডঃ গুপ্তা চাপা হুঙ্কার দিয়ে এক ঝটকায় বিশাল পাথরটা দুহাতে শূন্যে তুললেন। তারপর সেটা নিচে ছুড়ে ফেললেন। নিচে বিকট শব্দ করে পাথরটা পড়ল এবং গড়াতে গড়াতে চলল। ডঃ গুপ্তা হাত নাড়তে নাড়তে হাসিমুখে তাকালেন আমার দিকে। মুখের চেহারায় কেমন অস্বাভাবিকতা লক্ষ্য করে আমার অস্বস্তি হল। বললাম, 'ডঃ গুপ্তা আপনি দেখছি সুপারম্যানও বটে !

ডঃ গুপ্তা আমার কাছে এগিয়ে এসে সহাস্যে বললেন, 'মিঃ চৌধুরি, আমার ইচ্ছে করছে আপনাকে তুলে দূরে ছুড়ে ফেলি !'

আঁতকে উঠে বললাম, 'সে কী! না—না। দয়া করে ইচ্ছেটা একটু সামলে রাখুন মশাই !

'আমাকে ঘটোৎকচ মনে হচ্ছে না আপনার ?'

,হচ্ছে। খুব হচ্ছে। আপনি ঘটোৎকচই বটে।

ডঃ গুপ্টা ফিকফিক করে হাসতে হাসতে বললেন, 'খুব ভয় পেয়েছেন মনে হচ্ছে?'

'পেয়েছি বৈকি! আপনি অমন প্রকাণ্ড পাথরটা যেভাবে ছুড়ে ফেললেন!

'আরও শক্তি দেখবেন নাকি?' বলে ডঃ গুপ্তা দুর্গের উঁচু পাচিলটার দিকে এগিয়ে গেলেন। তারপর দুহাতে ঠেলতে শুরু করলেন। প্রকাণ্ড পাঁচিলটা সশব্দের ভেঙে পড়ল।

আমি এত ভয় পেয়ে গেছি যে পালিয়ে যাবার জন্য এদিক-ওদিক তাকিয়ে নিরাপদ পথ খুঁজছি। ডঃ গুপ্টা ফটকের পাশেই দাঁড়িয়ে আছেন। আগের মতো দুহাতের ধুলোময়লা ঝাড়তে ব্যস্ত। মুখে তৃপ্তির হাসি—কিন্তু কেমন অস্বভাবিকতাও ফুটে আছে।

হঠাৎ উনি ফের চাপা হুঙ্কার দিয়ে লাফ মারলেন এবং ওই লাফে অন্তত ফুট বিশেক উঁচু ফটকের মাথায় পৌঁছে গেলেন।

অমনি আমি নিচু পাঁচিলের ভাঙা অংশটা পেরিয়ে নামতে শুরু করলাম। এদিকটা ঢালু হয়ে নেমে গেছে। অজস্র পাথর আর ঝোপজঙ্গল ভর্তি। ভাগ্যিস নিচের গভীর গড়খাইটা শুকনো ছিল। হাঁচড়-পাঁচড় করে ওপারে উঠতেই প্রকৃতিবিদের দেখা পেলাম। রুদ্ধশ্বাসে বললাম, 'ডঃ গুপ্টা সুপারম্যান হয়ে গেছেন! কী সব সাংঘাতিক কাণ্ড শুরু করেছেন, দেখলে বুদ্ধি সুদ্ধি ঘুলিয়ে যাবে!

কর্নেল কিন্তু হাসছিলেন। বললেন, 'এখান থেকে বাইনোকুলারে আগাগোড়া সবটাই আমি দেখেছি ডালিং! তবে ডঃ গুপ্টাকে তোমার ভয় পাওয়ার কিছু নেই!'

'নেই মানে? আমাকে ছুঁড়ে ফেলার ইচ্ছে করছে বলেছিলেন।

কর্নেল পা বাড়িয়ে বললেন, 'সেই গল্পটা জানো তো? এক পাগল যাচ্ছে 'তাই পাগলামি শুরু করেছে। একটা লোক যেই

বলেছে, ওরে ! দেখিস যেন ঢিল ছোড়ে না—অমনি পাগল বলে উঠল, বাঃ ! মনে পড়িয়ে দিয়েছেরে ! ডঃ গুণ্টাকে আমরা হয়তো ওইরকম মনে পড়িয়ে দিয়েছি। যাইহোক, এস—বাংলোয় ফেরা যাক।’…

বিকেলে লনে বসে আছি কর্নেলের সঙ্গে, সেই সময় ডঃ গুণ্টাকে ফিরতে দেখলাম। হাসিমুখে সম্ভাষণ করে বললেন, ‘সেহরাগড় ফরেষ্টকে জব্দ করে এলাম, কর্নেল ! শ’খানেক শালগাছ উপড়েছি। একটা বাঘকে ছাতু করে দিয়েছি। একটা দাঁতাল হাতিকে আধমরা করে দিয়েছি। ঠ্যাং ভেঙে পড়ে আছে। আর ফোর্টের অবস্থাটাও দেখে আসুন গিয়ে। একখানা দেয়ালও আস্ত নেই।’

কর্নেল বললেন, কিন্তু আপনার খাওয়া-দাওয়া ? চৌকিদারকে আপনার খাবার টেবিলে রাখতে বলেছিলাম। দেখুন তো।’

ডঃ গুণ্টা বললেন, ‘আরে তাই তো ! আমার ক্ষিদে পেয়েছে যে ! আমি খাব—প্রচুর।

তারপর ধুপধাপ শব্দে মাটি কাঁপিয়ে দৌড়ুলেন। কর্নেল চেঁচিয়ে বললেন, ‘মাথায় ঠোক্কর লাগবে ডঃ গুণ্টা !’

ডঃ গুণ্টা তক্ষুণি নিচু হয়ে বারান্দায় উঠলেন এবং দরজার তালা খুলে ভেতরে ঢুকলেন। তারপর মিনিট দুই হয়েছে পর্দা তুলে চৌকিদারকে ডাকতে থাকলেন। চৌকিদার এসে বলল, ‘হুজুর !’

‘এটুকু খানা তুমি আমার জন্য রেখেছ ? আমি কি মাছি, না পিঁপড়ে ?’

চৌকিদার বেজার মুখে বলল, ‘আর তো কিছু নেই হুজুর ?’

‘চলো দেখি তোমার কিচেনে কী আছে।

ডঃ গুণ্টা কিচেনের দিকে গেলেন। চৌকিদারও গুটিসুটি পেছনে পেছনে গেল। কিন্তু একটু পরে সে দৌড়ে এল আমাদের কাছে। ‘হুজুর ! হুজুর ! উনি আদমি না রাক্ষস ? বাপরে বাপ ! চাল ময়দা সবজি যা ছিল— সব আসত গিলে খাচ্ছেন যে ! একটা ব্যবস্থা আপনারা করুণ হুজুর !’

ডঃ গুণ্টার হাঁক শোনা গেল, ‘চৌকিদার চৌকিদার !’

চৌকিদার চাপা গলায় বলল, 'দোষ-গলতি মাফ করবেন হুজুর। আমি এখনি ওপরয়ালার কাছে রিপোর্ট করতে চললুম।'

বেচারা চৌকিদার প্রায় লেজ তুলে দৌড়ুনোর মতো গেট দিয়ে উধাও হয়ে গেল। তারপর কিচেনের দিক থেকে ডঃ গুণ্টা বেরিয়ে এলেন। মুখে একরাশ ময়দা লেগে আছে। বললেন, 'এ কী বিচ্ছিরি খিদে বলুন তো কর্নেল! ইচ্ছে করছে, আপনাদেরও খেয়ে ফেলি।'

কর্নেল সহাস্যে বললেন, 'জঙ্গলে গিয়ে হরিণ-টরিণ ধরে খান ডঃ গুণ্টা। কী আর করবেন?'

ডঃ গুণ্টা সঙ্গে সঙ্গে পা বাড়ালেন। 'আরে তাই তো বটে!' বলে মাটি কাঁপিয়ে বাংলোর প্রাঙ্গণের ধারে উঁচু বেড়া মড়মড় করে ভেঙে বেরিয়ে গেলেন।

উদ্বিগ্ন হয়ে বললাম, 'কর্নেল! এখান থেকে চলে যাই আমরা। এ যে সত্যি ঘটোৎকচের কাণ্ড বেধে গেল।'

কর্নেল শুধু হাসলেন। আমার কথার কোনো জবাব দিলেন না।

ঘণ্টা দুই পরে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। বাংলোয় বিদ্যুতের আলোর ব্যবস্থা আছে। কিন্তু মশার বড্ড জ্বালাতন। তাই আমরা ঘরে বসে আছি। ডঃ গুণ্টার আর পাত্তা নেই। বলছিলাম, 'এতক্ষণ হয়তো জঙ্গলের সব হরিণ ওঁর পেটে চলে গেলে।' এমন সময় জিপের শব্দ হল বাইরে।

দুজন ফরেষ্ট অফিসার আর একদল গার্ড হন্তদন্ত এসে গেলেন। রেঞ্জার সায়েব আমার চেনা। হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, 'কর্নেল! এক অদ্ভূত কাণ্ড ঘটেছে। আপনার পাশের ঘরের সেই লম্বা ভদ্রলোক...'

কর্নেল কথা কেড়ে বললেন, 'বুঝেছি। জঙ্গলে হরিণের পাল সাবাড় করে বেড়াচ্ছেন।'

রেঞ্জার বললেন, 'দুঃখের কথা, আমরা ওঁকে গুলি করে মারতে বাধ্য হয়েছি।

'সে কী!'

'গুলি না করে উপায় ছিল না। উনি একজন ফরেষ্ট গার্ডকে আছাড় মেরে খুন করেছেন। সে এক বীভৎস দৃশ্য কর্নেল। লোকটা একেবারে নরদানব কিংকং বললেই চলে।'

কর্নেল আস্তে বললেন, 'ঠিকই করেছেন। তা না হলে এবার ভদ্রলোককে আটকানো কঠিন হত। ক্রমশ ওঁর ভেতর একটা ভয়ঙ্কর শক্তি জেগে উঠছিল। এরপর জঙ্গল ছেড়ে হয়তো উনি বসতী এলাকায় গিয়ে ঢুকতেন। তারপর আরও বীভৎস ঘটনা ঘটত।'

কথা নামিয়ে কর্নেল উঠে দাঁড়ালেন। 'চলুন তো, ওঁর ডেডবডিটা দেখে আসি।'

জিপে চেপে আমরা জঙ্গলের রাস্তা ধরলুম। দুই এগিয়ে বাঁদিকে একখানে আগুন জ্বলতে দেখা গেল। রেঞ্জার বললেন, 'ওই যে ওখানে। ডেডবডির পাহারায় দুজনকে বসিয়ে রেখে এসেছি।'

কাঠকুটো জ্বেলে লোক দুটো আসলে ভয় তাড়ানোর চেষ্টা করছিল। আমাদের দেখে সাহস ফিরে পেল। তারা বন দফতরেরই কর্মী। একজনের হাতে একটা বন্দুক, অন্য হাতের হাতে নিছক বল্লম। মুখে প্রচণ্ড আতঙ্কের ছাপ লেগে আছে। একটু তফাতে দল পাকানো রক্তাক্ত একটা লাস পড়ে ছিল। রেঞ্জার টর্চের আলোয় সেটা দেখিয়ে বললেন, 'এটা ফরেষ্টগার্ড মনি সিংয়ের ডেডবডি। কী অবস্থা হয়েছে দেখুন।'

কর্নেল বললেন, 'ডঃ গুপ্টার ডেডবডি কোথায় ?'

রেঞ্জার পা বাড়িয়ে বললেন, 'আসুন, দেখাচ্ছি।'

জায়গাটা খোলামেলা একটু এগিয়ে টর্চের আলোয় একটা ছোট্ট নদী দেখা গেল। বালি আর পাথরে ভর্তি। রেঞ্জার অবাক হয়ে বললেন, 'সর্বনাশ ! ডেডবডিটা কোথায় গেল ? জানোয়ারে টেনে নিয়ে গেল না তো ?'

বালির ওপর একটু রক্তের ছাপ চোখে পড়ল। কর্নেল টর্চের আলোয় খুঁটিয়ে জায়গাটা দেখে বললেন, 'নাঃ। টেনে নিয়ে যাওয়ার কোনো চিহ্ন নেই। কিন্তু···আশ্চয তো !' 'কী কর্নেল ?'

'মনে হচ্ছে, ডঃ গুণ্টা মারা য়ায়নি। দিব্যি পায়ে হেঁটে চলে গেছেন।'

'অসম্ভব! গুলি করার পর আমরা ওঁকে পরীক্ষা করে দেখে-গুলি করার পর আমরা ওঁকে পরীক্ষা করে দেখেছিলুম। দেহে প্রাণ ছিল না। তুটো গুলিই হার্টে লেগেছিল।'

যে তুটি লোক পাহারায় ছিল, তাদের একজন বলল, 'কী একটা শব্দ শুনেছিলুম কিছুক্ষণ আগে। টর্চ জ্বেলে কিন্তু কিছু দেখতে পাইনি।'

অন্য লোকটি বলল, 'আমি ভেবেছিলুম কোনো জানোয়ার।'

রেঞ্জার তাদের খুব বকাবকি করলেন। তারা আমতা-আমতা করছিল। বুঝতে পারছিলুম, ওদের বকাবকি করা বৃথা। বেচারাবা ভয়ে আধমরা হয়ে বসে ছিল। যদি দেখত, ডঃ গুণ্টার মরা হেঁটে যাচ্ছে, তাদের ভিরমি খেয়ে পড়ে থাকতে হত।

কর্নেল পায়ের ছাপ অনুসরণ করে নদীর ওপার পর্যন্ত গেলেন। আমরাও ওঁর সঙ্গে গেলুম। কিন্তু তারপর কঠিন পাথুরে মাটিতে আর কোনো ছাপ দেখা গেল না। কর্নেল উদ্বিগ্ন মুখে বললেন, 'সেহরাগড় টাউনশিপের লোকেদের ভাগ্যে কী আছে কে জানে! আমার মনে হচ্ছে, ব্যাপারটা অনেকদূর গড়াবে।'...

ফরেষ্টবাংলোয় ফিরে এ রাতে আর অন্ধকার বনভূমির সৌন্দর্য দেখার মন ছিল না। তাছাড়া মশার খুব উৎপাত সে কথা আগেই বলেছি।

অনেক রাত পর্যন্ত জেগে কাটাচ্ছিলুম। কর্নেলের নাক ডাক-ছিল যথারীতি। এক সময় হঠাৎ বাইরে কী একটা একটা শব্দ শব্দ হল। অমনি কর্নেলের নাক ডাকাও থেমে গেল। ওঁর ঘুম বরাবর এমনি পাতলা। ওদিকে পাশের ঘরে কেউ যেন চুপিচুপি তালা খুলছে। তারপর সাবধানে দরজা খুলল। কর্নেলের নড়া-চড়ার শব্দ শুনতে পেলুম। তারপর টেবিলবাতিটা জ্বলে উঠল। ফিস ফিস করে বললুম 'কর্নেল! পাশের ঘরে কে যেন ঢুকল।'

কর্নেলও ফিসফিস করে বললেন, 'চুপ!'

উনি বারান্দার দিকের জানালার পর্দা তুলে উঁকি দিলেন। আমিও ওঁর কাছে গিয়ে উঁকি দিলুম। বারান্দায় আলো আছে। একটু পরে শিউরে উঠে দেখি, পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে এলে স্বয়ং ডঃ আর পি গুপ্টা। হাতে একটা প্রকাণ্ড সুটকেস। পোশাকে ধূলো ময়লা আর চাপচাপ রক্ত লেগে আছে। বারান্দা থেকে নেমে এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে চলে গেলেন।

কর্নেল বললেন, 'যাক্‌গে। এবার নিশ্চিন্তে ঘুমোনো যাবে।'

বললুম, 'রহস্যটা কিন্তু শেষ পর্যন্ত রহস্যই থেকে গেল, কর্নেল!'

কর্নেল একটু হাসলেন। 'তা ঠিক। তবে যা আশঙ্কা করেছিলুম, সম্ভবত তত কিছু ঘটবে না। কারণ ফ্র্যাংকেনষ্টাইনের সেই দানব শেষ পর্যন্ত দানবই থেকে গিয়েছিলো। কিন্তু ডঃ গুপ্টাকে দেখলুম, দিব্যি ভদ্রলোকের মতো নিজের জিনিসপত্র নিতে এসেছিলেন। তার মানে, সুবুদ্ধির উদয় হয়েছে ওঁর এবং ঘরের ছেলে ঘরে ফেরাই সাব্যস্ত করেছেন।...

পরদিন আমরা জঙ্গল থেকে সেহরাগড় টাউনশিপে ফিরে গেলুম। তারপর সেখান থেকে বাসে চেপে ফৈজাবাদ। কলকাতা ফেরার ট্রেন রাত বারোটা নাগাদ। একটা হোটেলে খাওয়া-দাওয়া সেরে কর্নেল হঠাৎ বললেন, 'চলো জয়ন্ত, ডঃ গুপ্টার খোঁজখবর নিয়ে নিয়ে আসি।'

অবাক হয়ে বললুম, 'সর্বনাশ! উনি কি ফৈজাবাদের লোক নাকি?' 'বাংলোর খাতায় সেই ঠিকানাই তো জেনেছি।' 'কিন্তু...'

কর্নেল আমার কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'আমার ধারণা ডঃ গুপ্টা এখন আর নরদানব বা ঘটোৎকচ হয়ে নেই। কাজেই ওঁকে ভয় পাবারও কিছু নেই। হয়তো ভুলটা আমারই। আমি ওঁকে সচেতন করে দেওয়াতে ওইসব বীভৎস ঘটনা ঘটেছে। তোমাকে সেই পাগলের গল্পটা বলেছিলুম, আশাকরি মনে আছে। কোনো কারণে মানুষের মধ্যে অস্বাভাবিকতা এলে তাকে উত্যক্ত করা উচিত নয়।'

রাত তখন প্রায় নটা। কিন্তু ফৈজাবাদ ছোট্ট শহর! ডঃ গুণ্টাকে সবাই চেনে—সেটা উনি লম্বা মানুষ বলেই! শেষদিকে একটা টিলার গায়ে একটা পুরনো গড়নের বাড়ি। টাঙ্গাওয়ালা গেটের কাছে নামিয়ে দিল আমাদরে। লন পেরিয়ে যাবার সময় মনে হচ্ছিল, বাড়িতে যেন জনমানুষ নেই। অস্বাভাবিক স্তব্ধ পরিবেশ। তবে আলো দেখা যাচ্ছিল একটা ঘরে।

দরজার বোতাম টেপার বেশ কিছুক্ষণ পরে দরজা খুলল। সেই অস্বাভাবিক ঢ্যাঙা মানুষ, চেনা মুখ। অমায়িক হেসে বললেন, 'কোত্থেকে আসছেন আপনারা?'

আমি তো অবাক। কর্নেল নমস্কার করে বললেন, 'আপাতত আসছি সেহরাগড় থেকে। আপনার সঙ্গে কিছু জরুরি কথা আছে, ডঃ গুণ্টা।'

ডঃ গুণ্টা ভরু কুঁচকে কী স্মরণ করার চেষ্টা করে বললেন, 'সেহরাগড়? সেখানে তো একটা জঙ্গল আছে শুনেছি। যাক্‌গে, ভেতরে আসুন।'

ভেতরে আমরা বসলুম। ডঃ গুণ্টাও বসলেন। ওঁর মুখে বিস্ময় লক্ষ্য করছিলুম। কর্নেল বললেন, 'ডঃ গুণ্টা, আপনার প্রজেক্ট যে সাকসেসফুল সেই কথাটা বলতে এসেছি—যদিও দেশের আইনে আপনি অপরাধী সাব্যস্ত হয়েছেন!'

ডঃ গুণ্টা চমকে উঠলেন। 'কী বলছেন, ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'আপনারা ফ্যাণ্টম প্রতিমূর্তি সেহরাগড় জঙ্গলে বীভৎস কাণ্ড-কারখানা করেছে, জানেন কি?'

ডঃ গুণ্টা নড়ে বসলেন। 'মাই গুডনেস।'

'হ্যাঁ। এক ডজন হরিণ, একটা বাঘ আর একজন ফরেষ্ট গার্ডকে আপনারা ফ্যাণ্টম প্রতিমূর্তি খুন করে ফেলেছে। অসংখ্য গাছ উপড়ে ফেলেছে। সেহরাগড় কেল্লাটা ভাঙচুর করেছে। এমন কী, একটা দাঁতাল হাতিকেও মারাত্মক জখম করেছে।'

ডঃ গুণ্টা তুহাতে মুখ ঢেকে বসে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর ভাঙাগলায় বললেন, 'কিন্তু আমার তো কিছু মনে পড়ছে না।'

'কিন্তু আপনি একজন বায়ো-ফিজিশিষ্ট। আপনি জানতেন, আপনার, ফ্যাণ্টমপ্রজেক্টের পরিণতি সাংঘাতিক হতে পারে।'

ডঃ গুণ্টা উঠে দাঁড়িয়ে আস্তে বললেন, 'বিশ্বাস করুন, মাস-তিনেক আগে হঠাৎ আমার উচ্চতা বেড়ে যাওয়ার পর কী কী ঘটেছে এখন একটুও মনে নেই।

আইন কিন্তু আপনাকে ছেড়ে দেবে না ডঃ গুণ্টা।'

ডঃ গুণ্টা হঠাৎ সবেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। তারপর ঝনঝন দুমদাম প্রচণ্ড শব্দ শোনা গেল। উদ্বিগ্ন হয়ে বললুম, 'কী ব্যাপার কর্নেল?'

'কর্নেল হাসলেন, 'ল্যাবরেটরি ভাঙছেন! প্রমাণ লোপের চেষ্টা। যাইহোক, আর এখানে থাকা নিয়াপদ নয়, জয়ন্ত। চলো, আমরা কেটে পড়ি।'

ষ্টেশনে পৌঁছে বললুম, 'ফ্যাণ্টম প্রতিমূর্তি ব্যাপারটা কী খুলে বলুন তো?'

কর্নেল বললেন, প্রতিবস্তুর কথা নিশ্চয় শুনেছ মানুষের ব্যক্তি-সত্বার তেমনি কোনো প্রতিরূপ আছে কি না, এনিয়ে বায়োফিসিস্ট গবেষণা করেছেন। কতকটা ডঃ জেকিল এবং মিঃ হাইটের ব্যাপারটা যেমন। তবে ওই পরিরূপ ফ্যাণ্টম অস্তিত্ব কোনো মানুষের স্বাভাবিক চরিত্রের একেবারে উল্টো না হতেও পারে। আমাদের মধ্যে একটা করে প্রতি-মানুষ আছে। সে অসম্ভব শক্তিমান। তাকে দিয়ে যেমন ভাল কাজ করানো যায়, তেমনি খারাপ কাজও করানো যায়। কাজেই ওই ফ্যাণ্টম-প্রতিমূর্তিকে তুমি ঘটোৎকচ বলতেও পারো। ভুলে যেও না, মহাভারতের ঘটোৎকচ একজন মানুষ ছাড়া কিছু নয়। তবে অতিমানুষ। তাকে জাগালে ভাল বা মন্দ, দুই ঘটতে পারে।

ব্যাপারটা আমার মাথায় ঢুকছিল না! তাই বললুম, নিকুচি করেছে ফ্যাণ্টম ব্যাটার। তাকে জাগিয়ে কাজ নেই।'...



চোখ

আনন্দ বাগচী

এক একদিন এরকম হয়। ওরা চলে যাবার পরও আড্ডা তখন থামে না। আড্ডা তখন আমার মগজে পুরনো ফাটা 'রেকর্ডের' মত বাজতে থাকে। মেসের এক চিলতে ঘরে দড়ির খাটিয়ার ওপর চিৎপাত হয়ে শুয়ে বেড সুইচ নিবিয়ে নিষ্পন্দ হয়ে পড়ে থাকি। আমার কানের মধ্যে ভূপতি আর নলিনাক্ষর আবেগমাখা অফুরন্ত কথা আর তর্কবিতর্ক, যুক্তি আর পালটা যুক্তি ধারাবাহিক বাজতে থাকে। বিষয় থেকে বিষয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে চলা এক অসংলগ্ন নাবিকের মত। বা কখনো কোনা একটি ঝলসে ওঠা সংলাপ পিন বসে যাওয়া ফাটা রেকর্ডের মত একটি দুটি শব্দের আখরে মুহুর্মুহু বাজতে থাকে। তারপর এক সময় ঠাকুর এসে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে গলায় খাঁকারি দিয়ে ডাকে, বাবু খেতে আসেন!

ভূপতি ডাক্তার। হাসপাতালের সার্জন। প্রাইভেট প্র্যাকটিশ করে না বলে তার হাতে সময় আর মাথার খেয়ালের অন্ত নেই। কী একটা দুরূহ বিষয় নিয়ে ও অনেক দিন থেকে নিঃশব্দে গবেষণা করে চলেছে। আর নলিনাক্ষ কোনো কলেজের বটানির প্রফেসার। ওঁর লেখা টেক্সটবুক বাংলা ভাষায় একমাত্র বই যাকে অনেকেই সশ্রদ্ধ ঠাট্টায় বটানির বাইবেল বলে। একটা বইই ওকে বড়

করে দিয়েছে। ওদের দুজনের মাঝখানে আমি হাইফেনের মত এখনো বন্ধুত্বে অচ্ছেদ্য হয়ে আছি। কমনফ্রেণ্ড যাকে বলে। আমি নিজেও সত্যিই কমন। বিয়ে থা করিনি, চালচুলো নেই, মেসে থাকি। চাকরিটাও সাদামাটা। খবরের কাগজে। রংফলিয়ে বলা যায় সাংবাদিক, আসলে খবরের কেরাণী। টেলিপ্রিণ্টারের নিউজপ্রিণ্ট বাংলায় তর্জমা করি, সাজাই, হেডিং তৈরি করি, ব্যস এই পর্যন্ত। আর আড্ডায়ও আমার ভূমিকা গৌণ, ওদের তর্কাতর্কিকে উসকে দিয়ে দিয়ে জিইয়ে রাখা, চাঙ্গা করা।

আর ওরা আসে বলেই আমার যে শুধু সময় কাটে তাই না, আমি লাভবানও হই। অনেক নতুন কথা শুনতে পাই, জ্ঞানের কথা, অভিজ্ঞতার কথা, আবিষ্কারের কথা। ওরা দুজনেই বইয়ের পোকা, আর আমি বইকুণ্ঠ, কলেজ-ইউনিভার্সিটি ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বইও ছেড়েছি। এখন খবরের কাগজ ছাড়া ছাপা অক্ষরের সত্যি আমার কদাচিৎই সাক্ষাৎ হয়। তাই আমার রস আর রসদ আসে আমার ওই দুটি বন্ধুর কাছ থেকে। নলিনাক্ষর কাছ থেকেই আমি অনেক বিচিত্র আর বিলীয়মান গাছের কথা শুনেছি। অনেক দুষ্প্রাপ্য গাছের বটানিক্যাল নাম পর্যন্ত আমার কণ্ঠস্থ হয়েছে। আজ সবাই জানে গাছের প্রাণ আছে একথা আবিষ্কার করেছিলেন এক বাঙালী ভদ্রলোক। কিছু গাছেরও যে মন আছে; স্মৃতি আছে, রুচি অরুচি আছে, তারাও যে মানুষের মত কথা বলে, এমন কি মানুষের সঙ্গেও, ভয়ে ক্রোধে ভালোবাসায় উত্তেজিত হয়, হার্টফেল করে মারা যেতে পারে সে কথা নলিনাক্ষ না থাকলে আমি জানতেই পারতাম না।

আজকে ছিল ভূপতির দিন। আলোচনাটা শুরু হয়েছিল রাজনীতি নিয়ে, হাসপাতালের অচল অবস্থা নিয়ে। তারপর জ্যোতিষী, প্ল্যানচেট, জন্মান্তর ইত্যাদি বিষয়ে দুই বন্ধুর মল্লযুদ্ধ হতে হতে অ্যানাটমি-ফিজিওলজিতে এসে ঠেকল!

প্রথমে বেশ হালকা ভঙ্গিতেই শারীরিক অসঙ্গতি নিয়ে কথা

শুরু হয়েছিল। প্রায় সেটা আরম্ভ হয়েছিল, নলিনাক্ষর তরফ থেকেই। ও বলছিল, এরকম দেখেছি, এক একজন মানুষের চেহারা আর চরিত্রের সঙ্গে তার কোন বিশেষ অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মিল হয়নি। নিখুঁত মূর্তি গড়তে গড়তে ভগবান মাঝে মাঝে কেন এমন করেন জানি না। কারো হাত মনে হয় তার নিজের নয়, শরীরের ছাদের সঙ্গে একদম মানায়নি, কিংবা হাতের সঙ্গে আঙুল-গুলো, বেমানান দেখলেই মনে হয় হাতে ঝুলিয়ে নিয়ে যাচ্ছে—দু ছড়া কলার মত। মাথা যেন মাথা নয়—ঘাড়ে চেপে বসেছে উটকো ভাড়াটের মত। এই ভাবে কারো নাক, কারো কান, কারো পা। একজন ঢিলে-ঢালা অলস স্বভাবের মানুষ, দেখলেই বোঝা যায় আঠারো মাসে বছর কিন্তু হাঁটে যখন মনে হয় টাট্টু ঘোড়া ছুট লাগিয়েছে।

আমি বলেছিলাম, হ্যাঁ, এই অমিলগুলো হাসির কারণও হয়ে ওঠে কখনো কখনো। হয়তো আড়াইমন ওজনের পিঁপের মত মোটা লোকটা পেন্সিলের সিসের মত সরু গলায় কথা বলে ওঠে। আবার প্যাঁকাটি মার্কা নির্জীব চেহারার মানুষের গলায় মেঘ ডেকে ওঠে, চমকে গিয়ে তখন তোমার রবীন্দ্রনাথের সেই কবিতার লাইনটাই মনে পড়বে ঃ অ্যাতোটুকু যন্ত্র হতে এতো শব্দ হয়, সত্যি বিষম বিস্ময়কর ব্যাপারই বটে!

নলিনাক্ষ হাসল, হ্যাঁ, এই বিশ্বচরাচরের সমস্ত ব্যাপারের মধ্যেই একটা অদৃশ্য হার্মনি আছে। ছোট ঘড়ি বড় ঘড়ি সব এক মাত্রায় চলেছে। নিক্তি মাপা রাস্তায়। কিন্তু কখনো কখনো কিছু ব্যাপার খাপছাড়ার মত ঘটে। কেমন যেন শ্রিংকোনাইজ করে না। ঘড়ির কাঁটা এক কথা বলছে কিন্তু তার বাজনা অন্য কথা। ঘড়িতে আটটা বেজেছে হয়তো কিন্তু ঢং ঢং করে বারোটা বেজে গেল, দেখোনি কখনো? মানুষের চোখে আর ঠোঁটেও এমনি ঘটনা ঘটবে দেখেছি। ঠোঁটের সঙ্গে চোখ মিলছে না, কিংবা চোখের সঙ্গে ঠোঁট। হয়তো হাসির কথা বলছে। ঠোঁট-মুখ হাসিতে

ফেটে পড়ছে কিন্তু চোখ হাসছে না, কেমন বিষণ্ণ কিংবা ক্রুদ্ধ হয়ে আছে। খুব নিবিষ্ট হয়ে কোন সমস্যার কথা ভাবছে লোকটা কিন্তু তার চোখ দুটো খঞ্জনি পাখির মত নেচেই চলেছে অনবরত। কিংবা হাসছে রহস্য-ময় হাসি।

ভূপতি লুফে নিল কথাটা, 'ইয়েস নলিন, তুমি একটা জব্বর প্রশ্ন তুলেছ কিন্তু তার আগে বলি, চোখ আমাদের একটা ভাইটাল অর্গান। প্রতিমায় দেখোনি চক্ষু দান করা হয় সকলের শেষে, চক্ষু যোজনা মানেই প্রাণ প্রতিষ্ঠা। জড় পদার্থ দেখতে পায় না, কেন না তাদের প্রাণ নেই। তোমার সাবজেক্টেই আসি, গাছ দেখতে পায়, তার চোখ আছে, সে যে প্রাণী এইটেই তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ। চোখ আমাদের অর্ধেক মগজ, বলতে গেল আমাদের আমাদের বারো আনা মনই বাঁধা আছে তারমধ্যে। জীবনের একটা প্রধান ধর্মই হচ্ছে গ্রহণ এবং বর্জন। চোখের ভেতর দিয়ে সেই কাজটাই আমরা প্রতিমুহূর্তে করে যাচ্ছি। চোখ তাই কেবল শরীরের সৌন্দর্য বর্ধন করে না, সে আমাদের চেতনা বা প্রাণকে সজাগ রাখে।

আমি হেসে উঠলাম শব্দ করে। আমার হাসি মানেই উসকানি।

বললাম, 'তোমার কথাগুলো আমি ঠিক গিলতে পারছি না, বেজায় গুরুপাক হয়ে যাচ্ছে, ভূপতি। তোমরা বিজ্ঞানীরা আমি দেখেছি সহজ ব্যাপারটাকে কেমন জটিল করে তুলে আনন্দ পাও। চোখ জিনিসটা তো শুধু দেখবার জন্যে, যেমন চশমা। তারমধ্যে ফালতু এত সব ব্যাপার ঢুকিয়ে দিচ্ছ কেন?'

ভূপতি রেগে গেল। বলল, 'তোমার মুণ্ডু! সত্যি, মাথায় যদি তোমার শুধু গোবর পোড়া থাকত তাহলেও আশা ছিল। গোবর থেকে গ্যাস হয়, তা থেকে জ্বালানি, আলো, বৈদ্যুতিক শক্তি পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু যাদের খুলির মধ্যে শুধু রীম রীম নিউজ প্রিণ্ট ঠাসা তারা হোপলেস! চোখ দুটো দিয়ে কি আমরা শুধু দেখিরে হতভাগা! চোখ দিয়ে আমরা যেকোনো জিনিসকে

ছুঁতে পারি, আস্বাদন করতে পারি। আমাদের শাস্ত্রে আছে ঘ্রাণে অর্ধেক ভোজন হয়। কথাটার মধ্যে বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে। চোখ দিয়েও আমরা, খেতে পারি, শুনতে পারি, কথা কইতে পারি। ভিস্যুয়াল মেমরি বলে একটা কথা শোনা আছে নিশ্চয়। তা চোখের সত্যিই স্মরণ ক্ষমতা আছে, স্মৃতি আছে। একবারে তার নিজস্ব, মস্তিস্ক নিরপেক্ষ স্বাধীন ব্যাপার। বুঝলে ব্রাদার, এ-রকমটা নির্ভুল কমিউনিকেটিভ কম্পিউটার তুমি সারা দেহ তল্লাসী করলেও পাবে না। এই ব্যাপারটা নিয়েই আমি বহুকাল থেকে গবেষণা করে চলেছি। হয়তো একদিন প্রমাণ করে দিতে পারব।'

জানতাম। ভূপতির গবেষনার ব্যাপারটা আমার যে একেবারে অজানা ছিল তা নয়। নিউক্লিয়ার জিনস নিয়ে ও কি সব পরীক্ষা নিরীক্ষা করছিল তাও জানি। আমাদের শরীরের সবচেয়ে ছোট ইউনিট সেল বা কোষের যে নিজস্ব এতটা জীবন আছে প্রাণ আছে, আলাদা করে বেঁচে থাকা আছে এরকম একটা কথা ভূপতিই আমাকে একদিন বলেছিল। এই ইনার ইউনিভার্স এই অন্তবিশ্ব যার রহস্যের দরজায় ও ইলেকট্রন মাইক্রোসকোপ নিয়ে মাথা খুঁড়ে মরছে। কিন্তু চোখ, যা সহজেই আমাদের চোখে পড়ে, কোনো সূক্ষ্ম যন্ত্রের দরকার হয় না, তা নিয়ে যে এতখানি মাথা ঘামিয়েছে সেইটেই জানতাম না।

আজকেও ওরা চলে যাবার পর আলো নিবিয়ে খাটিয়ার ওপর চিৎপাত হয়ে আমি একটা ঘোরের মধ্যে পড়েছিলাম। না ঘুমোইনি, নিশ্চয়ই ঘুমোইনি। এই উত্তেজক আলোচনার সঙ্গে নিজের চিন্তা-ভাবনা মিশিয়ে কিছু ভাবনা মিশিয়ে কিছু ভাববার চেষ্টা করছিলাম। আমি বিজ্ঞানের ছাত্র নই, আমার চিন্তা সেই পথ ধরেও এগোচ্ছিল না। বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা চলে না এমন এক রহস্যের জট পাকানো সূতোর তাল দিয়ে নাড়াচাড়া করছিলাম। জন্মান্তর, এই জীবনের বাইরের জীবন, মানুষের ইচ্ছাশক্তি, জিনের স্রোত বেয়ে আসা মানুষের সংস্কার, অভ্যেস এবং সব শেষে এই অলৌকিক ক্যামেরা

চোখ—যার ভেতর দিয়ে এক জনের মন আর এক জনের মনের মধ্যে গিয়ে পৌঁছায়, সম্মোহনের এই চাবি কাঠি, এই এক ধরণের রিমোট কনট্রোল নিয়ে কল্পনার জাল বুনে চলেছিলাম এমন সময় আমার নাম ধরে কেউ ডাকল! ডাকল খুব কাছে থেকে, অদ্ভুত গলায়, আমার এক চিলতে ঘরের ঠিক দরজায় এসে।

এক ঝটকায় যেন গোটা মাকড়সার জালটা ছিঁড়ে আমার হাতে মুখে জড়িয়ে গেল, কে! আমি ধড়মড়িয়ে উঠে বসলাম। প্যাসেজের জিরো ওয়াটের কমজোরি আলোয় দেখলাম চৌকাঠে হাত রেখে এক সিলুয়েট মূর্তি।

'ঘুমিয়ে পড়েছিলেন নাকি ?

'কই না।'

হাত বাড়িয়ে সুইচ টিপলাম। বার কয়েক চোখ পিট পিট করে টিউবলাইটটা জ্বলে উঠল। আলোয় চিনলাল। আমাদের মেসের নতুন বোর্ডার। সুশ্রী ছিপ-ছিপে নায়ক-নায়ক চেহারা। একবার তাকালে ঝট করে চোখ সরিয়ে নেওয়া যায় না। বয়স গোটা পঁয়ত্রিয়ের মধ্যে। দিন পাঁচেক হল এখানে এসে উঠেছেন, কিন্তু আলাপ হয়নি। এমনিতেই আমি একটু অমিশুক তার ওপর গোটা সপ্তাহটাই নাইট ডিউটিতে গেছে। নিশাচর প্রাণীর মত দিনে ঘুমোনো আর সন্ধ্যে হলেই কোটর ছেড়ে বেরিয়ে পড়া। তবু আসতে যেতে দু'-এক ঝলক দেখেছি দূর থেকে।

একখানা চেয়ার এগিয়ে দিয়ে বললাম, 'আসুন আসুন।'

'স্যরি, ডিসটার্ব করলাম নাকি।'

'না না সে কি!'

'দীপক ব্যানার্জী, পাটনা থেকে এসেছি।' চেয়ারে বসে পড়ে সহাস্যে নমস্কার জানালো।

'আমি ধ্যানেশ সেন, খবরের কাগজে আছি।'

'জানি। মানে শুনেছি। আমি তো আপনার পাশের ঘরেই আছি।'

আমি জানতাম না, কারণ পাশের ঘরে অন্য একজন ছিলেন। তিনি বোধহয় ঘর বদলে নিয়েছেন। এটা সেটা দুচার কথায় আলাপ জমে উঠল। দীপকের বাড়ি পাটনায়। অবস্থা বেশ ভাল। চাকরিটা শখের। এক ওষুধ কোম্পানীর রিপ্রেজেণ্টেটিভ, বদলি হয়ে কলকাতায় এসেছে।

ইতস্তত করে এক সময় বলল, 'আপনার বন্ধুটি কি চোখের ডাক্তার ?'

প্রসঙ্গটা ধরতে না পেরে আমি জিজ্ঞাসু চোখে ওর মুখের দিকে তাকালাম। আর তখনই সত্যি করে চমকালাম। এতক্ষণ মনের যে অস্বস্তির কারণটা ঠিক ধরতে পারছিলাম না এবার স্পষ্ট করে চোখে পড়ল। সেই চোখ। দীপকের চোখ দুটো কেমন সবুজ লুমিনাস পেণ্টের মত, থেকে আলো পড়ে জ্বলে উঠছে। কিছু কিছু পশু চোখ এরকম জ্বলে কিন্তু সেটা তেমন কোন ব্যাপার নয়। আসল ব্যাপার বোধহয় অন্য! ওর চোখের দিকে ভাল করে তাকিয়ে মনে হল আর দশজনের যেমন হয় তেমন না। এ চোখ যেন ওর সমস্ত অস্তিত্বের বাইরে আলাদা এক ব্যক্তিত্ব। যেন আলাদা একটা মানুষ ওই চোখের ভেতর দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। শিরদাঁড়ার ভেতরটার কেমন শিরশির করে উঠল। বুদ্ধি কিংবা কথা দিয়ে ও ঠিক ব্যাখ্যা করা যায় না। একটা অশরীরী অস্তিত্বের গন্ধ পাচ্ছিলাম যেন।

আমার মুখের চেহারা নিশ্চয় পাল্টে গিয়েছিল। ভয়-পাওয়া লোকের মত হয়তো ফ্যাকাসে দেখাচ্ছিল।

চাপা গলায় দীপক বলল, 'আমার চোখের দিকে কী দেখছেন অমন করে ?'

ধরা পড়ে গিয়ে আমি তাড়াতাড়ি কথা ঘোরালাম, 'কই না। ভাবছিলাম আপনি আমার কোন বন্ধুর কথা জিজ্ঞেস করছেন।'

গলা পরিষ্কার করে নিয়ে দীপক বলল, 'ক্ষমা করবেন, এটাকে আড়ি পাতা ভাববেন না। আপনাদের আড্ডার সব কথাই আমি

স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিলাম পাশের ঘর থেকে। ভেরী ইন্টারেষ্টিং সাবজেকট, অন্তত আমার কাছে। আপনার যে বন্ধুটি চোখের কথা বলছিলেন, উনি নিশ্চয়ই আই স্পেশালিস্ট ?'

'ও তাই বলুন। না। চোখের ডাক্তার না। তবে—'

'তবে ?'

'চোখের ব্যাপার নিয়ে ওর একটা কেমন ক্ষ্যাপামি আছে। চক্ষু বিষয়ে কি একটা গবেষণা করছে বলল।'

'শুনলাম। তবে আই মাস্ট সে ক্ষ্যাপামি নয়। আমি এ ব্যাপারে, একেবারেই অজ্ঞ, আনাড়ি। তবু বলব, ওঁর অ্যানালিসিস আমাকে চমকে দিয়েছে, চোখ ফুটিয়েছে—,

আমি কথা বলছিলাম কিন্তু আমার চোখ দুটোকে যেন কোন জোরালো চুম্বক টানছিল। চুরি করে এক আধ পলকের জন্য আমি দীপকের চোখের দিকে দীপক শব্দ করে হেসে উঠল। বিস্মিত গলায় বললাম, 'হাসছেন ?'

দীপক মাথা নেড়ে বলল, 'হ্যাঁ,। এ হাসি অনেক দুঃখের, ধ্যানেশবাবু।'

'বুঝলাম না।'

'ইফ ইউ ডোণ্ট মাইণ্ড, একটা প্রশ্ন করব।'

'কি প্রশ্ন ?' অস্বস্তি নিয়ে প্রশ্ন করলাম।

'আপনি আমার চোখ দেখছিলেন। দেখছিলেন না ?'

একটি সময় নিয়ে শেষে শুকনো গলায় বললাম, 'হ্যাঁ।'

'দেখে কি মনে হচ্ছে ? এ আমার নিজের চোখ নয়, তাই না ?'

উত্তর দিতে পারলাম না। বুকের ভেতরটা কেমন কেঁপে গেল। লোকটা কি মনের কথা সব টের পায়! বিব্রত হয়ে চুপ করে থাকলাম।

'ঠিকই ধরেছেন। এ চোখ আমার নিজের নয়।'

আমি হতভম্ব। দীপক আমার দিকে তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। ভাবছি কিছু একটা বলা দরকার। কিন্তু আমাকে কিছুই বলতে হলনা, ও নিজেই আবার কথা বলল।

'বিলীভ মি। এ চোখ আমার সত্যিই নিজের নয়। আর সেটা বুঝতে পারলাম প্রথম কলকাতায় এসে। তা দিন দশেক আগে, তখনো মেসে এসে উঠিনি। এখানে এসে প্রথমে একটা ভাড়া বাড়িতে উঠেছিলাম। তারপর সেখানে থেকে পালিয়ে এই মেসে। একটা বিবর্ণ হাসি দীপকের ঠোঁটে ভেসে উঠে ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল, 'কিন্তু আমি মূর্খ, নিজের কাছ থেকে কি কেউ পালাতে পারে!'

ভদ্রতাবশত আমি বাধা দিলাম, 'কী বলছেন আপনি। আপনার কথার মাথামুণ্ডু কিছু বুঝতে পারছি না।'

'পারবেন। তবে সে এক লং স্টোরি। আপনাকে বোর করছি না তো?'

দীপককে দেখে, তার কথা শুনে আমার কৌতূহল ক্রমশ বাড়ছিল। এই চোখের পিছনে কি রহস্য লুকোনো আছে কে জানে।

বললাম, 'ঠিক উল্টো। বলুন আপনি। গল্পো শুনতে কার না ভাল লাগে!'

'এটা কিন্তু গপ্পো নয়। ফ্যাকট, সত্যি ঘটনা। ব্যাকরণ ভুল হল নিশ্চয়ই, ট্রু ফ্যাকটের মত। তবে আপনার কোন কারণ নেই, যতদূর সংক্ষেপে বলা যায় তাই বলব।'

দীপকের কথাগুলোকে ছাটকাট করে সাজালে তার মুখের গল্পটা এই রকম দাঁড়ায়:

সম্পূর্ণ অন্ধ হয়ে গেলে এই পৃথিবী, এই চারপাশ, এই জীবন কেমন লাগে আমার জানা আছে। কারণ এক-টানা পাঁচ বছর আমি কমপ্লিট ব্লাইণ্ড হয়ে ঘরে বসেছিলাম। আমার দুনিয়া তখন দুহাতের গণ্ডির মধ্যে, হাতড়ে বেড়ানো ছোট্ট পরিধির মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। ঘড়ি তখন শুধু কানে শোনা একটা বাদ্যযন্ত্র ছাড়া কিছু নয়। প্রহরে প্রহরে ভাগ করা, দিন আর রাত একাকার হয়ে গিয়ে অনিঃশেষ একটি ভয়ঙ্কর রাত্তির হয়ে গিয়েছিল, যে রাত্রে চাঁদ

নেই, তারা নেই, নিরেট নিশ্চিদ্র অন্ধকার ছাড়া কিছু নেই। আমার জীবন অর্থহীন আমার আহার বিস্বাদ, আমার প্রিয় বইগুলো বোবা। সম্পূর্ণ একলা মানুষের চেয়েও আমি নিঃসঙ্গ, একা। শব্দ এবং নৈঃশব্দের মাঝখানে বন্দী প্রেতের মত ভেসে রয়েছে। এই যন্ত্রণার তুলনা হয় না।

অথচ দুর্ঘটনা ঘটে এরকমই অকারণে এক পলকে ঘটে যায়। ঘটনার পিছনে যুক্তি থাকে, কিন্তু দুর্ঘটনার কোনো যুক্তি নেই। অর্থাৎ সেটা না ঘটতেই পারত তবু ঘটল। আমার তিরিশ বছরের জীবনে বছর বছর হোলির দিন এসেছে, চলে গেছে। সাবান মেখে সে আবির আর রঙ তুলে ফেলেছে। কিন্তু প্রায় পাঁচ বছর আগের দোলের দিনটি বোধহয় আলকাতার মত কালো রঙ নিয়ে এসেছিল। সেদিন ফাগুয়ার তাণ্ডবের মধ্যে কেউ আমার চোখে রং ছুঁড়েছিল। কি ছিল সেই রঙের মধ্যে জানি না, অনেক কষ্টে যখন চোখ খুললাম তখন দুটো চোখেই আর দৃষ্টি বেবাক অন্ধ হয়ে গেছি। চোখের সামনে যেন কোনো মানুষ নেই, দৃশ্য নেই, কিচ্ছু নেই। তবু তখনো একটু আলো ছিল, ঠিক আলো নয়, আলোর আভার মত। ঠিক কি রকম জানেন, গভীর জলের তলায় ডুব দিয়ে চোখ খুললে যেমন দেখা যায় অনেকটা সেই রকম। ডাক্তার বদ্যি এলেন কিন্তু তারা বিদায় নেবার আগেই সে আভাটুকুও আমার দুচোখ ছেড়ে চলে গেল।

পাটনায় আমরা তিন পুরুষের প্রবাসী বাঙালী। আমার ঠাকুর্দা ছিলেন বিহারের ও অঞ্চলের বিধান রায়। বাবা এখনো ডাকসাইটে অ্যাডভোকেট। দুই পুরুষের জমানো সম্পত্তি আমার একটা জীবনেও ফেলে ছড়িয়ে বোধ হয় শেষ করতে পারব না। কত বড় বড় কানকশান আমাদের। দিল্লীর দরবার ইস্তক ছড়ানো। তবু শেষ চেষ্টা, ভাই ব্যাঙ্ক থেকে এক জোড়া চোখ পেতে আমাকে দীর্ঘকাল অপেক্ষা করে থাকতে হল। রক্ত বললেই যেমন রক্ত, ব্লাড-গ্রুপ মিলতে হয়, চোখ বললেই তেমনি চোখ নয়। আমাদের

দেহকোষ বা সেলের আধার সে টিস্যু, তার স্বভাব, তার চরিত্রও বিচিত্র। ফরেনবডিকে সহজে গ্রহণ করতে চায় না। বোধহয় তারও পছন্দ অপছন্দ আছে।

শেষ পর্যন্ত তেমন চোখ পাওয়া গেল। অপারেশনও সাকসেস-ফুল হল। আমি আবার তাদের মতই দৃষ্টি ফিরে পেলাম। আগে লেখাপড়া করার জন্যে চশমার দরকার হত, এখন হয় না। চোখ ভাল হল, কিন্তু চশমা বেচারি ইনভ্যালিড হয়ে গেল, তার চোখ হারালো। আমি খুশী, আমার যেন পুনর্জন্ম হল। আমি আবার পুরনো কাজে বহাল হলাম।

দিন যাচ্ছিল তর তর করে, ভালই। কিন্তু কোথায় যে ছন্দ কেটে গেছে টের পাইনি তখনও। আসলে আমার স্বভাবের মধ্যে পরিবর্তন আনছিল! চির ধরছিল মনের মধ্যে। সব মানুষের মনের মধ্যেই হ্যাঁ আর না থাকে। অর্থাৎ মনের মধ্যে এক ইহ্যাঁ আর না থাকে। অর্থাৎ এক মনের মধ্যে দুই মন। এক মন যাতে সায় দেয়, অন্য মন তাতেই বাগড়া দিতে চায়। তবে এটা খুবই অস্পষ্ট আকারে এবং কখনো কদাচিৎ, তাই তেমন করে বুঝতে পারা যায় না। কিন্তু আমার কেস আলাদা, দুটোই সমান জোরালো। থেকে থেকে টাগ অফ ওয়ার লেগে যায়। এর ফলে কিনা জানি না আমি ক্রমশ কেমন রাগী হয়ে উঠছিলাম।

এই সময় অফিস থেকে আমাকে কলকাতায় পাঠাতে চাইল। আগের দিন হলেই নিশ্চয়ই এই বদলিতে রাজী হতাম না। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, আমার জন্যে আমার মনটা কেমন নেচে উঠল। চলে এলাম, বাড়ির অমত সত্বেও। বাসাও ভাড়া নিলাম একটা। কিন্তু কলকাতায় এসে একটা নতুন উপসর্গ দেখা দিল আমার চোখে থেকে ডবল ভিসন দেখতে লাগলাম, ডবল ইমেজ বললে স্পষ্ট হবে কথাটা। প্রথম দিনের কথাই বলি। কলকাতায় সেটা আমার দ্বিতীয় দিন। একটা রাস্তা দিয়ে হনহনিয়ে যাচ্ছিলাম হঠাৎ থমকে দাঁড়াতে হল একটা চেনা দোকান দেখে। থরে থরে

কাচের শোকেসের ওপিঠে যে লোকটি বসেছে সে আমার বহুদিনের চেনা। এমন কি তার পেছনের ক্যালেণ্ডারের ছবিটি পর্যন্ত। মনে পড়ল এই দোকানে কতদিন সর-পুরিয়া খেয়েছি। পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলাম। মাইগড! একি দেখছি ক্যালেণ্ডারের শালটি ১৯৭৪। ঠিক দশ বছরের পুরনো। এরকম ঝকঝকে দোকানে এক পুরনো ক্যালেণ্ডার? চোখ রগড়ে তাকালাম। দৃষ্টি বিভ্রম ছুটে গেল। দেখলাম, না। ১৯৮৪ সালেরই ক্যালেণ্ডার। আর ছবিটা আদৌ আমার চেনা নয়। চেনা নয় ক্যাশবাক্স আগলে বসা লোকটাও। আর সবচেয়ে তাজ্জব ব্যাপার, কাঁচের শোকেসের রসগোল্লা সন্দেশ সর-পুরিয়া কোন ভোজবাজীতে রুপোর গয়না হয়ে গেছে। ঝকমকে বাউটি, কানপাশা, টায়রা, কাঁকই। যেন ইলেকট্রিক শখ খেলাম। খেয়াল হল এই রাস্তায় জীবনে এই প্রথম পা রেখেছি। আসলে কলকাতায় এই আমার স্বচক্ষে আসা। এর আগেও একবার অবশ্য এসেছিলাম, মাস কয়েক আগে। সে তো সোজা হাসপাতালে, অন্ধ অবস্থায়। আই গ্র্যাফটিংয়ের পর কালো চশমা পরে সোজা দমদম এয়ারপোর্ট। সুতরাং চেনা লাগবার আদপেই কোনো রাস্তা নেই।

আমাকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকতে দেখে জিজ্ঞেস করল, কি চাই আপনার, বলুন দেখাচ্ছি।

আমি ঢোক গিলে বললাম, এখানে কাছে পিঠে একটা মিষ্টির দোকান ছিল না?

ছিল, কিন্তু এখন নেই। লোকটা হাসল, আপনি বোধহয় অনেককাল এ পাড়ায় আসেননি?

কেন বলুন তো?

এইটেই মিষ্টির দোকান ছিল। বছর দুই আগে—

লোকটিকে কথা শেষ করতে না দিয়ে আমি পালিয়ে এসেছিলাম সেদিন। কিন্তু পর পর আরও গুটি তিনেক ঘটনা ঘটল সেই দিনই। সবই দৃষ্টি বিভ্রমের। কোনটার সঙ্গে কোনটার মিল নেই।

উলটো পালটা, রহস্যময়। সে সব ডিটেলস বলে আপনাকে বোর করব না! তবে কথাটা এই, রীতিমত ভড়কে গেলাম। কেমন মনে হল চোখ খারাপ হয়েছে, তাই এরকম হলিউশন দেখছি। বোধহয় চশমাই নিতে হবে।

একজন নাম করা আই স্পেশালিষ্টের কাছে গেলাম। তিনি নানাভাবে পরীক্ষা করে বললেন, আপনার চোখের স্বাস্থ্য বোধহয় আপনার থেকেও ভাল। আপনি বরং অমুক ডাক্তারের সঙ্গে আজই দেখা করুন। ওঁর চিঠি নিয়ে সেখানে গেলাম। তিনি সাইকিয়াট্রিষ্ট। সাদা বাংলায় পাগলের ডাক্তার। আমাকে নানাভাবে বাজিয়ে দেখলেন। তারপর দাঁত খিঁচিয়ে বললেন, দূর মশাই, আপনার চোদ্দ পুরুষে কেউ পাগল নয়। সাধের পাগল না সেজে সোজা বাড়ি যান। একটা ঘুমের বড়ি দিচ্ছি। সেটি গিলে একখানা উনিশ রীলের ঘুম লাগান। দেখবেন ফ্রেশ হয়ে গেছেন।

ঘুমের বড়ি আর হালকা মন নিয়ে বাসায় ফিরেছিলাম শুয়ে আছে আমার পিছনে। তার গায়ে অসম্ভব তাপ, যেন পুড়ে যাচ্ছে। যন্ত্রণায় নিঃশব্দে ছটফট করছে লোকটা। থেকে থেকে তার ছোঁয়া লাগছে আমার গায়ে। সে ছোঁয়া কি রকম জানেন। বোবায় ধরলে, কিংবা হঠাৎ ভূতের ভয় পেলে যেরকম গাটা ভারি হয়ে যায় সেই রকম।

পরদিন ধুম জ্বর নিয়ে জ্ঞান ফিরল যখন তখন দুপুর গড়িয়ে গেছে। এক সহকর্মীর বাড়িতে দিন দুয়েক কাটিয়ে তারই চেষ্টায় উঠে এলাম এই মেসে। এখানে অন্তত একা থাকতে হবে না। সিঙ্গল সীটের রুম দিতে চেয়েছিলেন ম্যানেজার, নিইনি। আমার ঘরে আর একজন ভদ্রলোক আছেন।

*　　　*　　　*

দীপক ব্যানার্জীর গল্পটা এইখানেই শেষ হতে পারতো, কিন্তু হল না, ভূপতি আর আমি কি করে ওর গল্পের সঙ্গে জড়িয়ে গেলাম। নলিনাক্ষ অবশ্য সব শুনে বলেছিল, এটা বিজ্ঞানের যুগ। অলৌকিক

গাঁজাখুরি গল্পের পেছনে তোরা যদি দৌড়তে চাস দৌড়ো, আমি ওসবের মধ্যে নেই। লোকটার হয় মাথার গোলমাল, নয়তো মিথ্যে বলছে।'

'মিথ্যে বলে লাভ ?'

'এক একজন লোক দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে ওরকম মিথ্যে বলে। তাছাড়া অন্য ধান্ধাও থাকতে পারে।'

'কি ধান্ধা ?

'কি করে জানবো!' নলিনাক্ষ পাশ কাটিয়ে গেল। আমার অবশ্য ওরকম মনে হল না। দীপকের সঙ্গে কথা বলে যেটুকু বুঝেছি তাতে ওর মাথার গোলমাল থাকতে পারে কিন্তু মিছে কথা বলছে না। আর অন্য কোনো মতলব নিশ্চয়ই নেই। ভূপতি তো ওর কেসটা লুফেই নিল। তার থিওরির এমন কংক্রিট উদাহরণ একেবারে হাতের গোড়ায় এসে যাবে, এ যেন ভাবাই যায় না। সবচেয়ে সুবিধের কথা এই, আমাদের তিনজনের মধ্যে ব্যাপারটা নিয়ে কোন লুকোচাপা নেই। দীপক জানে আমরা তার শুভার্থী, তার এই বিপদের দিনে আমরা তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছি দুই ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মত।

ভূপতির অনুমান এই নতুন চোখজোড়া থেকেই দীপকের এই বিপত্তি শুরু হয়েছে। কিন্তু একটা প্রশ্ন তবু থেকেই যায়। দৃষ্টি ফিরে পাবার পরেও কয়েকমাস দীপক পাটনায় ছিল। এই নতুন চোখের প্রতিক্রিয়া তাহলে তখন ঘটেনি কেন। সত্যি বলতে কি, কলকাতায় আসার ডবল ভিশন দেখার মত কোন ঘটনাই তার জীবনে ঘটেনি। কেন ঘটেনি ? কলকাতায় এসেই বা কেন ঘটলো। এখানে এসে যে বাড়ি ভাড়া নিয়েছিল। সেই বাড়ি থেকেই কি তার ওপরে অলৌকিক কোন শক্তি ভর করল ? যে শক্তি তাকে অতীতকে দেখার শক্তি যোগায় কোন কোন মুহূর্তে ? একই রাস্তায় একই সঙ্গে অতীত এবং বর্তমানকে পাশাপাশি দেখতে পাওয়া অবিশ্বাস্য ব্যাপার। ত্রিকালঙ সিদ্ধ-পুরুষরা অতীত

বর্তমানের পাশে ভবিষ্যৎকেও দেখতে পান। ফিল্মের ডবল একসপোজারের মত শোনা যায় ট্রিপল একসপোজার। তিনটে ছবিই পরস্পরের মধ্যে গায়ে গায়ে সাঁটা। তব ওসব পৌরাণিক গাল গল্প বলে উড়িয়ে দেওয়া গেলেও দীপকের ব্যাপারটা কি? ভৌতিক কাহিনী? তাহলে তো প্রেতাত্মায় বিশ্বাস করতে হয়।

ভূপতি কোন গল্পে সন্তুষ্ট হবার মানুষ নয়। বিজ্ঞানের মাপকাঠিতেই সে সব কিছু মাপতে চায়। তাই তার খুঁটিনাটি প্রশ্নের শেষ নেই। দীপককে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নানা কথা জিজ্ঞেস করে আর নোট নেয়। কোন হাসপাতালে কবে তার অপারেশন হয়েছিল, কে অপারেশন করেছিলেন। তার পাটনার ঠিকানা, কলকাতায় সেই ভাড়া বাসার ঠিকানা। অসুস্থ অবস্থায় যে সহকর্মীর বাড়িতে ছিল। যে চোখের ডাক্তার, যে সাইকিয়াট্রিস্ট তাকে দেখেছিলেন তাদের সকলের নামধাম বিবরণ যে ভাবে সে নোট করে নিল তাতে বুঝলাম ভূপতির সামনে এখন হাতে কলমে অনেক কাজ। মুখে কিছু না বলুক, তার অনুসন্ধানী অভিযান শুরু হয়ে গেছে। দীপকের গল্প আমি অবিশ্বাস করছিনা, কিন্তু সত্যি বলতে কি তার সঙ্গে আলাপ হবার পরে পুরো একটা সপ্তাহ কেটে গেছে অথচ ও রকম ঘটনা আর একদিনও ঘটেনি। ভূপতির কথা মত দীপক দিন দশেকের ছুটি নিয়েছে, কাছে বেরোচ্ছে না। এই কদিন আমি আর ভূপতি পালা করে ওর সঙ্গে সেঁটে রয়েছি। এক সঙ্গে খাই, ঘুমোই, বেড়িয়ে বেড়াই। বসে বসে গল্প করি। কিন্তু কোন বিস্ময়কর ঘটনা পলকের জন্যেও ঘটেনি। নলিনাক্ষ প্রায় প্রতিদিনই আসে, দীপকের অলক্ষ্যে সে আমাদের দিকে তাকিয়ে বাঁকা হাসি হেসে চলে যায়। আমরা কিছুই বলি না, বলার কিই বা আছে। হাতে নাতে প্রমাণ দেখাতে না পারলে অবিশ্বাসীকে বিশ্বাস করানো যায় না। উলটে বিশ্বাসী মানুষের মনও ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে আসে। আমার মনের অবস্থা এখন খানিকটা সেই রকমই। দীপকের চোখ জোড়া দীপকের মুখের সঙ্গে মেলেনি,

তার স্বভাবের সঙ্গে বেমানান হয়ে আছে—সেটা টের পাই। সেটা হতেই পারে, কারণ ওই চোখ ওর নিজের নয়, আর একজনের, বাইরে থেকে চেষ্টা করে জোড়া লাগানো। তাই এ রকম মনে হতেই পারে। রাতের বেলায় এক আধ মুহূর্তের জন্যে ওর চোখের মধ্যে সবুজ আলোর ঝিলিক ভূপতিও দেখেছে। ওর চোখের ক্লোজ আপ ছবিও ভূপতি তুলেছে কয়েকখানা।

কিন্তু এতে কি প্রমাণ হয়? কিছুই না। অবিশ্যি সুস্থ মনে হলেও দীপক একেক সময় কেমন উল্টো পাল্টা ব্যবহার করে। দারুণ হাসাহাসি গল্প গুজব চলছে হঠাৎ দীপক গম্ভীর হয়ে গেল, মিনিট দশেক গুম হয়ে বসে থাকল, একটি কথা বলল না। কিংবা দিব্যি বেড়াচ্ছি, আচমকা কি হল, কোন কথা না বলে ও হঠাৎ পিছন ফিরে হনহনিয়ে হাঁটা দিল। পরে এ নিয়ে কথা হলে ও অবাক হয়, ও বিশ্বাস করতেই চায় না ও রকম কিছু করেছে বলে। নলিনাক্ষ শুনে বলে, এ সব শো বিজনেস বুঝলে।

আজকেও দুজনে বেড়াচ্ছিলাম। রোজ দুচার মাইল আমরা এভাবে হাঁটি। ভূপতি। ভূপতি আজ দিন তিনেক কলকাতায় নেই। বোধহয় পাটনায় গেছে। আজকাল ও যে কি করে, কিভাবে, কিছুই ভেঙে বলে না। আমার ওপর শুধু একট নির্দেশ রেখে গেছে, দীপককে যেন সব সময় চোখে চোখে রাখি। রাখছিও। আজকেও গল্প করতে করতে ফিরছিলাম। হঠাৎ একটা কাণ্ড হল।

ফুটপাথের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একটা অ্যামবাসাডার সবে চলতে শুরু করেছে এমন সময় দীপক গাড়ির মধ্যে কাউকে দেখতে পেয়েই পাগলের মত চিৎকার করতে করতে ছুটে গেল। আমি ভাল করে কিছু বুঝে ওঠার আগেই দেখলাম চলন্ত গাড়ির দরজা খুলে ফেলে বিদ্যুৎগতিতে সে গাড়ির ভেতর ঢুকে গেল। গাড়িটাও থামল না, টপ স্পীডে বেরিয়ে গেল। আমি বোকার মত দীপকের নাম ধ'রে ডাকতে ডাকতে কিছুদূর পর্যন্ত দৌড়ালাম। শেষে হতভম্ব

হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম রাস্তার মাঝখানে। ধারে কাছে একটা ট্যাক্সি পেয়ে গেলেও গাড়িটার পিছু ধাওয়া করতে পারতাম হয়তো, কিন্তু দরকারের সময়ে এই শহরে হাতের কাছে কিছুই পাওয়া যায় না। বহুক্ষণ দীপকের জন্যে অপেক্ষা করেও যখন দীপক ফিরল না আমার দুশ্চিন্তা হতে লাগল। মনে হল কাল রাতেই আমার থানায় ডায়েরী করা উচিত ছিল।

থানায় যাবার জন্যে জামা কাপড় পরছি এমন সময় সেই ভোর সকালে ভূপতি এসে হাজির, মুখে চোখে ক্লান্তি। চুল উস্কোখুস্কো কিন্তু ঠোঁটে একটা সাফল্যের হাসি। এ সময় ও কখনো আসে না। তাই ভীষণ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'কিরে কী ব্যাপার? কোথায় ডুব মেরেছিলি এই কদিন।'

ভূপতি উত্তেজিত গলায় বলল, 'সে অনেক কথা, পরে বলব। তবে আসল রহস্যের বোধহয় যবনিকা তুলতে পেরেছি। প্রথম থেকেই আমি এরকমটাই সন্দেহ করেছিলাম।'

আমি নিজের কথা, দীপকের কথা সেই মুহূর্তের জন্যে ভুলে গিয়ে সংক্ষেপে ভূপতির অনুসন্ধানের যে কাহিনী শুনলাম সে সত্যি রোমাঞ্চকর। বছর খানেক আগের আমাদের কাগজের হেডলাইন-গুলো আমার চোখে যেন ভেসে উঠল। কারণ সেগুলো আমিই লিখেছিলাম।

অনেকগুলো ডাকাতির মামলার ফেরারী আসামী ভাস্কর নস্কর ওরফে ফান্টাবাবুর হত্যার ব্যাপার নিয়ে তখন কলকাতায় ক'দিন খুব হৈ চৈ হয়েছিল। এই লোকটির শরীরে দুটি রিভলভারের বুলেট পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু সে জন্য নয়। এক দল লোকের ধারনা হয়েছিল বেওয়ারিশ এই লোকটিকে দিয়ে আসামী সাজিয়ে পুলিস অন্য কোন বড় ব্যাপার ধামাচাপা দিতে চাইছে। পুলিস অবশ্য ফান্টাবাবুর খুনীকে ধরতে পারেনি, শুধু খুনীর ফেলে যাওয়া রিভলভার আর কয়েক ফোঁটা রক্ত আবিষ্কার করেছিল। খুনীর ব্লাড গ্রুপ আর আঙুলের ছাপ ছাড়া তাদের রেকর্ডে আর কিছু নথিপত্র হয়নি। এদিকে মুমূর্ষু লোকটি যে দৃষ্টান্ত রেখে

গিয়েছিল তা অভানীয়, মৃত্যুকালে সে তার দুটি চোখই আই ব্যাঙ্ককে দান করে গিয়েছিল। তার এই শেষ ইচ্ছার কারণ হিসেবে বলেছিল, সে এখন মরতে চায় না। আরও কিছুদিন বেঁচে থাকতে চায়। প্রায় কবির মতই কথা। 'মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে। মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।' যাইহোক, ভাস্করবাবু ওরফে ফাণ্টাবাবু সত্যিই ডাকাত ছিল কিনা তা জানা না গেলেও সে যে অমানুষিক ইচ্ছাশক্তির অধিকারী ছিল সে বিষয়ে ডাক্তাররা দ্বিমত হননি। ছ' ছ'টি বুলেট হজম করে, ফুসফুসে—হৃৎপিণ্ডে সরাসরি জখম হয়েও কোন মানুষ যে ঘণ্টাখানেক মৃত্যুর সঙ্গে সজ্ঞানে যুঝতে পারে এবং তার চোখ দুটো তুলে নেবার জন্যে পীড়াপীড়ি করতে পারে, তাদের কেতাবী বিদ্যায়-এর ব্যাখ্যা নেই।

কিন্তু আমাদের কাছে সবচেয়ে বড় খবর ফাণ্টাবাবুর এই চোখ দুটিই শেষ পর্যন্ত দীপকের কপালে জুটেছিল।

ভূপতির মুখে দীপকের নাম শোনা মাত্র আমি সম্বিৎ ফিরে পেলাম। ভূপতিকে ওর নিরুদ্দেশের খবর বললাম।

ভূপতি চমকে ওঠে বলল, 'সে কি ? থানায় ডায়েরী করেছিলি ? অ্যাঁ তাও করিসনি, যাঃ ইডিয়েট ! গাড়িটার রং আর নম্বরও নিশ্চয় এতক্ষণে গুলে মেরে দিয়েছিস ? না !'

কালো রং আর আমার একটি প্রিয় সংখ্যা পরপর চারবার ব্যবহার হওয়ায় নাম্বার প্লেট মনের মধ্যে জ্বল জ্বল করছিল। ছুটলাম লোকাল থানায়, সেখান থেকে লালবাজারে, তারপর দক্ষিণ কলকাতার এক হাসপাতালেই কাল রাতে যে অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির আহত ও সংজ্ঞাহীন দেহ পুলিস রাস্তা থেকে হাসপাতালে কুড়িয়ে নিয়ে এসেছিল তাকে দীপক ব্যানার্জী বলে সনাক্ত করে আমরা ফের ছুটলাম ভূপতির এক্স-পেশেণ্ট এবং প্রায় বন্ধুস্থানীয় ব্যারিস্টার ডি, আর মিত্রর কাছে। আইন আদালতের খবরে যাঁদের বিন্দুমাত্র কৌতূহলও আছে তাঁরাই মিত্র সাহেবকে নামে এবং কাহিনীতে চিনবেন। অপরাধীদের কাছে এই ক্ষুরবুদ্ধি

আইনজীবী মানুষটি ডিয়ার তো নন-ই, মিত্রও নন। লোকে রসিকতা করে বলে, ইংরেজী ডেনজার শব্দের আদি এবং অন্তের অক্ষর দুটি নিয়ে ধ্রুব রঞ্জনের ডি, আর।

রূপকথার গল্পের মতই দীপকের গল্পও এই খানে শেষ। সুস্থ হয়ে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে সে মেসে ফিরে এসেছিল। তবে রাজসাক্ষী হয়ে তাকে যথাসময়ে কোর্টে হাজির হতে হয়েছিল। কারণ আমার দেওয়া গাড়ির নম্বর, আর তার দেওয়া মোটর আরোহীর বিবরণের সঙ্গে পুলিস বছর খানেক আগে তুলে রাখা আঙুলের ছাপ আর রক্ত মিলিয়ে ফাণ্টাবাবুর হত্যাকারীকে হাত কড়া পরিয়েছিল! সে অনেক ঘটনা এখন। তবে দীপকের চোখ আর তাকে কোনদিন ট্রাবল দেয়নি। কিন্তু ভূপতির থিওরি এই-খানে এসেই আচমকা একটা ধাক্কা খেয়েছে।



আর মন খারাপ হবে না

শেখর বসু



উনিশশো নিরানব্বই সাল সুইজারল্যাণ্ডের বার্ন শহরের এক-ধারে একটা আকাশছোঁয়া বাড়ির সাতাশ তলার সতেরো নম্বর ঘরে মনখারাপ করে বসে ছিল একটি ছেলে। মুখ ভার হয়েই ছিল ছেলেটির, এবার চোখ ছলছল করে উঠল। তারপর ওর গাল গড়িয়ে কয়েক ফোঁটা জল পড়ল ফ্লোরের লাল-টুকটুকে কার্পেটের ওপর। আর ঠিক তক্ষুনি ডোর-বেল বেজে উঠল।

জামার হাতায় কোনোমতে চোখের জল মুছে দরজা খুলল ছেলেটি। দরজা খুলতেই ঘরে ঢুকলেন বেঁটেখাটো চেহারার মাঝবয়সী এক ভদ্রলোক। ভদ্রলোকের মাথায় চকচকে টাক, কিন্তু থুতনিতে ঘন ছাগলদাড়ি ভদ্রলোক বিখ্যাত এক সুইস কম্পানির ইঞ্জিনিয়ার, আর স্থানীয় বেঙ্গলি ক্লাবের প্রেসিডেণ্ট। নাম সুনন্দ মিত্র। চাকরি নিয়ে বা ট্রেনিং নিতে বার্নে কোনো বাঙালি ছেলে এলেই মিস্টার মিত্রের প্রথম কাজ হল তাকে ক্লাবের মেম্বার করে নেওয়া। তার পরের কাজ তাকে দিয়ে অবসর সময়ে বঙ্গ-সাহিত্য ও সংস্কৃতির চর্চা করানো। এর ফাঁকে-ফাঁকে তিনি তাকে খাঁটি সুইস-জার্মান ভাষাশিক্ষার তালিম দিয়ে থাকেন।

যে ছেলেটি এইমাত্র ঘরের দরজা খুলে দিল তার নাম শৌভিক

বন্ধু। শৌভিকের চেহারা রোগা-পাতলা, তবে কিছুখণ ধরে কেঁদে কেঁদে চোখমুখ ফুলিয়ে বসে আছে। দরজা খোলার সময় শৌভিক চোখমুখ আড়াল করে রেখেছিল। এবার সেদিকে চোখ পড়তেই মিস্টার মিত্র অবাক হয়ে বললেন, "আরে! কী ব্যাপার! কী হয়েছে তোমার ?

স্বাভাবিক হওয়ার চেষ্টা করে উত্তর দিল শৌভিক, "না কিছু না।"

"কিছু না মানে? কিছু না হলে কেউ কি···কারও সঙ্গে কি তোমার কোনো গোলমাল হয়েছে ?"

"না।"

"ন্না, নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে। তুমি লুকোচ্ছ আমাকে।

শৌভিক আরও কয়েকবার 'না-না' করল কিন্তু মিস্টার মিত্র নাছোড়। শেষকালে সত্যি কথাটা বলতেই হল শৌভিককে, আর তাই শুনে সুনন্দ মিত্রের সে কী হাসি! আর থামতেই চায় না। হাসতে-হাসতে সোফার ওপর প্রায় গড়িয়ে পড়লেন তিনি।

কারও দুঃখের কথা শুনে কেউ এমন অসভ্যের মতো হাসতে পারে, কল্পনার বাইরে ছিল শৌভিকের। অত হাসি দেখে ও প্রথমে বেশ অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিল, কিন্তু এখন ওর রাগ হয়ে গেল।

মিস্টার মিত্র কোনোমতে হাসি থামিয়ে ছাগলদাড়ির মধ্যে আঙুল চালাতে-চালাতে "শৌভিক, এটা ১৯৯৯ সাল। ওটা কি এখন আর কোনো সমস্যা হতে পারে ?"

কথাটার মানে বুঝতে পারল না শৌভিক।

মিস্টার মিত্র একটা ছোট্ট চেহারার সিগারেট ধরিয়ে বললেন, "বার্নে ঠিক কতদিন হল তুমি এসেছ ?"

"আজ নিয়ে সাতদিন।" থতমত খেয়ে উত্তর দিল শৌভিক।

"তোমার বয়েস কত হল ?"

"আঠারো বছর।"

"আজকের দিনে আঠারো বছর বয়সেও তুমি হোমসিক হয়ে পড়ছ ?"

"হ্যাঁ, মা'র কথা ভীষণ মনে পড়ছে। আর মনে পড়ছে ছোট বোনটার কথা। এগারো বছর বয়েস। বাড়িতে যতক্ষণ থাকতাম, ও আমার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরত। বলতে বলতে শৌভিকের গলা ধরে এল।

ওর কথা শুনে মিস্টার মিত্র আবার অসভ্যের মতো খ্যাকখ্যাক করে হেসে উঠলেন, তারপর প্রায় লাফিয়ে উঠে টেনে নিলেন টেলিফোনটা। টেলিফোনে ঝড়ের গতিতে সুইস-জার্মান ভাষায় কার সঙ্গে কথা বলার পরে শৌভিকের দিকে তাকিয়ে বললেন, "আর মিনিট-দশেক বাড়ির জন্য মনখারাপ করো, তারপর সব ঠিক হয়ে যাবে।"

কথাটার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারল না শৌভিক।

ঠিক দশ মিনিটের মাথায় আবার ডোর-বেল বাজল। এবার দরজা খুললেন মিস্টার মিত্র। ঘরে ঢুকল দুজন সাহেব, ওদের হাতে অদ্ভুত চেহারার সব যন্ত্রপাতি। শৌভিককে দেখিয়ে মিস্টার মিত্র কীসব বলতেই এক সাহেব এসে ওর মাথায় একটা হেলমেট পরিয়ে দিল।

শৌভিক আপত্তি করতে যাচ্ছিল, কিন্তু মিস্টার মিত্র ওকে ইঙ্গিতে চুপ করে বসে থাকতে বললেন। হেলমেট পরাবার পরে সাহেব ওর চোখে একটা সবুজ চশমা পরিয়ে দিল। চশমার সঙ্গে অনেকগুলো তার, তারের প্রান্তগুলো বিদঘুটে চেহারার একটা মেশিনের সঙ্গে আটকানো। মেশিনের একটা বোতাম টিপতেই নানা ধরনের আলো জ্বলতে-নিবতে লাগল শৌভিকের চোখের সামনে।

মিস্টার মিত্র শৌভিকের কাঁধে হাত রেখে আস্তে আস্তে বললেন, "তুমি এবার বাড়ির কথা ভাবো।"

"মানে ?" থতমত খেয়ে বলে উঠল শৌভিক।

মিস্টায় মিত্র শাসনের গলায় বললেন, "তুমি একটু আগে বাড়ির কথা ভেবে ভেবে মন খারাপ করছিলে না ? হ্যাঁ কি না বলো"

"হ্যাঁ।"

"কী ভাবছিলে ?"

"ভাবছিলাম···।"

"যা ভাবছিলে তাই ভেবে যাও।"

মিনিটখানেকের মধ্যে আনন্দে ঝলমল করে উঠল শৌভিকের মুখ।

ঠিক আট মিনিট পরে লালমুখো সাহেব দুজনের একজন বিদঘুটে চেহারার ওই মেশিনটার আর একটা বোতাম টিপতেই শৌভিকের চোখের সামনের আলোগুলো নিবে গেল।

মাথা থেকে হেলমেট আর চোখ থেকে চশমা খুলে নেবার পরেও শৌভিকের ভ্যাবাচ্যাকা ভাবটা একটুও কাটল না। ও অদ্ভুত চোখে তাকিয়ে ছিল মিস্টার মিত্রের মুখের দিকে।

মিস্টার মিত্র শৌভিকের কাঁধদুটো ঝাঁকিয়ে দিয়ে মুচকি হেসে বললেন, "শৌভিক, তুমি এখন কোথায় ? কলকাতার ষষ্ঠীতলা রোডে ? না, সুইজারল্যাণ্ডের বার্ন শহরে ?"

শৌভিক দু-হাত দিয়ে চোখ মুছে অবাক গলায় বলল, "বিশ্বাস করুন, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। একটু আগে আমি বোধহয় ষষ্ঠীতলা রোডে আমাদের বাড়িতেই ছিলাম। আমার বাঁদিকে দাঁড়িয়ে ছিল আমার মা, সামনে ছোট বোন মিনু···কিন্তু, সেটাই বা কী করে সম্ভব ?"

ওর কথা শুনে মিস্টার মিত্র আবার গলা ফাটিয়ে হা-হা করে হেসে উঠলেন, কিন্তু ভদ্রলোকের হাসিটা এবার আর শৌভিকের একটুও অসত্যের মতো বলে মনে হল না।

লালমুখো সাহেবদুজন কখন যেন চলে গেছে। সেণ্টার-টেবিলের ওপর পড়ে আছে সেই হেলমেট, সবুজ চশমা আর সাবানের মতো দেখতে অসংখ্য বোতাম-বসানো ছোট্ট একটা মেশিন।

হাসি থামিয়ে সেই মেশিনটার দিকে আঙুল তুলে মিস্টার মিত্র

বললেন, "এটা এখন তোমার। বাড়ির জন্যে আর কক্ষনো তোমার মন কেমন করবে না।"

"কী এটা?" বাচ্চাদের মতো কৌতূহল নিয়ে জিজ্ঞেস করল শৌভিক।

"আরে এটাই তো আসল জিনিস। এর নাম মেমরো-ভিশুয়াল ক্যাসেট। এর সাহায্যে তোমার মেমারিতে যা আছে তার একটা অংশ তুমি ভিশুয়ালাইজ করতে পারবে। এই হেলমেট আর চশমা আঁটলেই স্মৃতির ছবি তোমার চোখের সামনে ভেসে উঠবে। মনে হবে, ওই ছবির মধ্যেই আছ তুমি। ব্যাস, সঙ্গে সঙ্গে মন ভাল হয়ে যাবে তোমার।"

মিস্টার মিত্রের কথাগুলো অবিশ্বাস্য ঠেকছিল শৌভিকের, কিন্তু বিশ্বাস না করে উপায় নেই। একটু আগে বিচিত্র এক অভিজ্ঞতা হয়েছে ওর। মনে হচ্ছিল কলকাতায় বাড়ির লোকদের মধ্যে বসে বসে গল্প করছে ও। মিনুর কথাগুলো এখনও তো ওর কানের ওপর বাজছে। সিগারেট ধরিয়ে বললেন, "জুরিখের একজন বৈজ্ঞানিক কিছুদিন হল এটা আবিষ্কার করেছেন। কী ভাবে আবিষ্কার করেছেন জানো?"

"না।" সুবোধ বালকের মতো দুদিকে মাথা নাড়িয়ে উত্তর দিল শৌভিক।

মিস্টার মিত্র ছোট্ট সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে বললেন, "এই বৈজ্ঞানিকের নাম ফ্রেডরিখ উইস। আবিষ্কারের পেছনে এঁর ছোট ছেলের বিরাট একটা ভূমিকা আছে। ছেলেটা ছিল রাম-কাঁদুনে। উইস আর তাঁর বউ সকালবেলায় ল্যাবরেটরিতে যাবার আগে ছেলেকে একটা ক্রেশে দিয়ে যেতেন। ক্রেশে ছেলেটার সমবয়সী আরও অনেক বাচ্চা ছিল, কিন্তু ছেলেটা কারও সঙ্গে খেলবে না। কত খেলনা কিন্তু একটাও ছুঁয়ে দেখবে না। খালি মা-মা করে কাঁদবে। নার্সারির প্রিন্সিপ্যাল নিরুপায় হয়ে একদিন ডক্টর উইসকে বললেন; আপনি বাচ্চাকে অন্য কোথাও দিন, একে শান্ত

করার সাধ্য নেই আমাদের। শুধু ওখানেই নয়, সব ক্রেশের টিচারদেরই এক কথা—আপনার ছেলেকে আমরা রাখতে পারছি না। মহা মুশকিলে পড়লেন উইস-দম্পতি। দুজনেই বৈজ্ঞানিক, বিজ্ঞান-চর্চা শিকেয় তুলে ছেলে মানুষ করা কি সম্ভব! এখন উপায়? মিস্টার মিত্র প্রশ্নটা এমনভাবে ছুঁড়ে দিলেন যেন সমস্যার সমাধান বার করার দায়িত্ব শৌভিকের।

কী উত্তর দেবে বুঝতে না পেরে চুপ করে রইল শৌভিক। মিস্টার মিত্র ছোট সিগারেটে ছোট্ট একটা টান মেরে বললেন, "এখন উপায়? উপায় একটা বার করতেই হবে। মাথা খাটাতে শুরু করে দিলেন ডক্টর উইস, তারপর হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করে ফেললেন মেমরো-ভিশুয়াল ক্যাসেট। ব্যস, সব সমস্যা মিটে গেল ম্যাজিকের মতো ছেলে কাঁদলেই ক্রেশের টিচাররা বাচ্চার, মাথায় হেলমেট আর চোখে চশমা এঁটে দিতেন। অমনি কান্না বন্ধ। বাচ্চা হাসিমুখে হাততালি দিতে মা-মা, ডা-ডা বলত।"

"দারুণ!" শৌভিক নিজেই হাততালি দিয়ে উঠল বাচ্চাদের মতো।

মিস্টার মিত্র সিগারেটের টুকরোটা অ্যাশ্‌ট্রের মধ্যে গুঁজে দিয়ে বললেন, "আবিষ্কারের খবরটা ছড়িয়ে পড়তেই হৈ-হৈ পড়ে গেল সারা দেশে। ছিঁচকাঁদুনে বাচ্চার সংখ্যা কম নয়, সবাই ছুটে এল ডক্টর উইসের কাছে। কিন্তু একা উইসের পক্ষে সবার আবদার সামলানো সম্ভব নয়। তাল বুঝে একটা আন্তর্জাতিক কম্পানি এগিয়ে এসে বলল, আমরা মেমরো-ভিশুয়াল ক্যাসেট বানাতে চাই, আমাদের সঙ্গে চুক্তিতে আসুন। ব্যস, রাতারাতি বিলিওনিয়ার হয়ে গেলেন ডক্টর উইস। তবে মজাটা কী জানো—"মজাটা কী, বলার আগেই একটু হেসে নিলেন মিস্টার মিত্র।

তারপর আবার বলতে শুরু করলেন, "বাচ্চারাই শুধু ছিঁচকাঁদুনে হয় না, অনেক বাচ্চারা মায়েরাও একটু ছিচকাঁদুনে স্বভাবের হয়। কিণ্ডারগার্টেনে বাচ্চারা হয়তো দিব্যি খেলাধুলো করছে, কিন্তু

অফিসে গিয়ে বাচ্চাদের কথা ভেবে কিছু-কিছু মায়ের খুব মন খারাপ হয়ে যায়। তারাও তখন কাজের ফাঁকে-ফাঁকে মেমরো-ভিশুয়াল ক্যাসেট ব্যবহার করে মন ভাল করে নিতে শুরু করল। তারপর আছে তোমাদের মতো ছেলে মেয়েরা। দূরদেশে গেলেই বাড়ির কথা ভেবে ভেবে মন খারাপ করে ফেলে। তোমাদের হোমসিকনেস কাটাবার কাজেও এই ক্যাসেটটা অব্যর্থ।"

আরো কিছুক্ষণ গল্প করার পরে মিস্টার মিত্র চলে গেলেন। আর চলে যেতেই হেলমেট আর চশমা এঁটে বোতাম টিপে দিল শৌভিক। সঙ্গে সঙ্গে সবকিছু অদ্ভুতভাবে পালটে গেল।

ষষ্ঠীতলার দোতলার ঘরে বেতের চেয়ারে বসে বসে গল্পের বই পড়ছে শৌভিক। মিনু খাটের ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে ড্রয়িং খাতায় একটা ম[illegible]দার চেহারার ভূতের ছবি আঁকতে আঁকতে নিজের মনেই হেসে উঠেছে। মা'র একসঙ্গে তিনটে ঘরের কাজ করা স্বভাব, তাই প্রতি তিন মিনিট অন্তর একবার করে এ-ঘরে ঢুকে কী যেন একটা করে যাচ্ছে। হঠাৎ মিনু লাফ দিয়ে উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, ফিরে এল একটু পরে। তারপর পা টিপে টিপে দাদার কাছে এসে বলল, দাদা, কোনো কিছুর গন্ধ পাচ্ছিস? অনেকটা বাতাস নাকের মধ্যে টেনে নিয়ে দাদা মাথা নাড়ল দুদিকে। মিনু চোখ বড়-বড় করে বলল, পাচ্ছিস না? আমি কিন্তু ঠিক পেয়েছি। তারপরেই হাততালি দিয়ে বলে উঠল, মা চাইনিজ খাবার বানাচ্ছে।

ঠিক আট মিনিট পরে শৌভিকের চোখের সামনে থেকে মিলিয়ে গেল বাড়ির ছবিটা। হেলমেট আর চশমাটা টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখার পরেও অবাক ভাবটা কাটছিল না ওর। সত্যি-সত্যি কোথায় এখন ও? ষষ্ঠীতলায় না বার্নে? তারপরেই তারিফ করার চোখে তাকাল ক্যাসেটটার দিকে বাড়ির জন্যে সেই মন-কেমন করাটা এখন আর একদম নেই।

সুইজারল্যাণ্ডে পাক্কা দু-বছর ছিল শৌভিক, কিন্তু বাড়ির কথা ভেবে আর একদিনও ও কাঁদেনি। একটু মনখারাপ করলেই

ও হেলমেট আর চশমাটা এটে নিত। ব্যস্, সঙ্গে সঙ্গে মন-মেজাজ দারুণ ভাল হয়ে যেত।

দু-বছর একদিনের মাথায় মাথায় সুইজারল্যাণ্ড থেকে দেশে ফেরার প্লেনে উঠল শৌভিক। বাড়ির জন্যে ওর আর এখন একটুও মনখারাপ করছে না, কিন্তু সমানে ছটপট করছিল কখন বাড়ি পৌছবে ভেবে। তারপরেই মনে হল, আরে! মিন্নুর যা লম্বাটে গড়ন, এই দু-বছরে ও নির্ঘাত আরো অনেকটা লম্বা হয়ে গেছে। হয়তো এখন শখ করে শাড়ি পড়ে মাঝেমধ্যে।

শাড়ি-পরা লম্বা মিন্নুর ছবিটা মনে মনে ভেবে নিয়ে হেলমেট আর চশমা এঁটে মেমরো-ভিশুয়াল ক্যাসেটের বোতাম টিপে দিল শৌভিক। ওই তো মিন্নু! এই দু-বছরে ও মাথায় বেড়ে গেছে কিছুটা, তার ওপর শাড়ি পরে দিব্যি বড়সড় দেখাচ্ছে ওকে। ক্যালকাটা এয়ারপোর্টে প্লেন থেকে নামার আগে আরো অনেকবার ক্যাসেট চালিয়েছিল শৌভিক।

মা, বাবা আর মিন্নু তিনজনেই এসেছিল এয়ারপোর্টে। পাক্কা দু-বছর বাদে ওদের দেখে শৌভিকের সে কী আনন্দ! কিন্তু ও সবচাইতে অবাক হয়ে গিয়েছিল মিন্নুকে দেখে। মেমরো-ভিশুয়ালে মিন্নুকে যেমন দেখাচ্ছিল, মিন্নু অবিকল সেইরকম। শাড়ি পরে ও যেন এখন রীতিমত একজন ভদ্রমহিলা। ভদ্রমহিলা আবার একটু লাজুক প্রকৃতির।

এয়ারপোর্ট থেকে গাড়ি চেপে বাড়ি ফেরার পথে শৌভিক বলল, "মিন্নু, একটু আগে প্লেনের মধ্যে তোকে আমি যেমন দেখে-ছিলাম, তুই ঠিক সেইরকমই দেখতে।"

কথাটার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে না পেরে মিন্নু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, "মানে?"

উত্তরে রহস্যময় হাসি হাসল ওর দাদা, তারপর বলল, "বাড়ি চল্ বলছি।"

সমাপ্ত